১৮৯০

প্রজাপতয়ে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য ছোট গল্পের বই :

টুটাফুটা, ইতি, অধিবাস, অকাল বসন্ত, দিগন্ত,
রুদ্রের আবির্ভাব, নায়ক-নায়িকা, সঙ্কেতময়ী,
ডবল ডেকার, পলায়ন

সূচীপত্র

প্রজাপতয়ে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৩৪০

আমি অবিবাহিত যুবক ; তদুপরি, মানে সর্বোপরি, উচ্চ পুচ্ছে সমাসীন, এবং নিজেই নিজের কথা বলি, একজন নামী লিখিয়ে। নামী লিখিয়ে, কিন্তু কত বড় যে নাম সেদিন বুঝলুম গোবিন্দপদবাবুর সঙ্গে কথা বলে'। গোবিন্দপদবাবু একজন মস্ত কর্ম্মচারী। মার্জনা করবেন, কোন জাতীয় কর্মচারী তা বলতে পারবোনা। পাটেরও ভাবতে পারেন, লাটেরও ভাবতে পারেন। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, একজন দার্শনিক কর্মচারী, যাকে বলে সমতল জীবন ও উত্তুঙ্গ চিন্তা—প্লেন লিভিং য়্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং—তারই তিনি শরীরী নিদর্শন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখেন, দেশলায়ের কাঠিতে অনবরত দাঁত খোঁচান আর অপর্যাপ্ত ডাব খান।

বিকেলবেলা বিছানায় শুয়ে দেয়ালজোড়া ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে পরবর্তী লাল তারিখ খুঁজছিলুম, শুনতে পেলুম সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। রোমাঞ্চিত হব কিনা ভাবছিলুম, দেখলুম, তার মানে শুনলুম, নেহাৎই ঢলঢলে চটি-জুতোর শব্দ। আগেই বলেছি, আমার বাড়িতে পর্দাও নেই, সাইন-বোর্ডও নেই, কেননা আমি বিয়ে করিনি ; আর আপনারা, যাঁরা পুরুষ, তাঁরা জানেন স্ত্রী-ই যেমন স্বামীর পর্দা তেমনি স্ত্রী-ই আবার স্বামীর সাইনবোর্ড। তাই যে-কেউ যে-কোনো সময় যে-কোনোভাবে আমার বাড়িতে, দোতলায়, আমার শোবার ঘরে, বিনা-আয়াসে, বিনা-জিজ্ঞাসায় সরাসরি উঠে আসতে পারতো। 'ভায়া, আছ নাকি হে?' এ-কথাটুকুও অন্তরাল থেকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার মনে করতো না। মনে করতো, যখন একা আছি, তখন নিশ্চয়ই আর আমি লুকিয়ে নেই।

একা থাকাই যে লুকিয়ে থাকা সেটা অন্তত দার্শনিক গোবিন্দ-দাদা বুঝবেন এটা আশা করেছিলুম। পৃথিবীতে এত লোকের মধ্যে গোবিন্দপদ-বাবু এসেছেন আমার বাড়িতে, আমারই সঙ্গে আড্ডা দিতে, এটা প্রায় অলৌকিকের এলেকায়। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম অমিলই বয়সে, প্রায়

দুই যুগের ব্যবধান। তিনি প্রস্তরযুগের লোক, আর আমি ঘোরতর কলিকালের—যেমন বাচাল তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। বলা বাহুল্য এ-দুটো বিশেষণ গোবিন্দপদবাবুরই উপহার।

বিস্মিত হবার সময় না দিয়েই গোবিন্দপদবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। কোনো বাগাড়ম্বর না করে সোজা জিগগেস করলেন: 'হ্যাঁ হে, তুমি নাকি লেখ?'

এটা ধমক না অভিনন্দন প্রথমটা ধারণা করতে পারলুম না। উঠে বসে' একবার ঠোঁট চাটলুম। বললুম, 'কী লিখি?'

'কী লেখ মানে? বুঝতে পাচ্ছ না? যদি বলি, তুমি নাকি টান, তবে বুঝতে পার না, কী টান?' গোবিন্দপদবাবু গুম্ফদ্বয় গম্ভীর করে' তুললেন।

বললুম, 'পারি না। কেননা মদও টানতে পারি, গাঁজাও টানতে পারি। তেমনি 'লেখ' বললে হিসেবও লিখতে পারি, হস্তলিপিও লিখতে পারি।'

'ন্যাকা!' গোবিন্দপদবাবু বক্র ভ্রূভঙ্গি করলেন। বললেন, 'বই লেখ নাকি?'

যেন কী দুষ্কর্ম করি এমনি এক-খানা পাপার্ত মুখ করে' বললুম, 'হ্যাঁ, লিখি। কে বললে আপনাকে?'

'আর সে-সব নাকি খুব খারাপ লেখা?' গোবিন্দপদবাবুর গলার স্বরটা নিখাদ থেকে ঋষভে নেমে এল।

লেখা খারাপ না লেখাটা খারাপ প্রশ্নটা অনুধাবন করতে বেগ পাচ্ছিলুম। মানে, ভঙ্গি ও বস্তুর মধ্যে কোনটা নিন্দনীয়?

গোবিন্দবাবু দ্বিধা করতে দিলেন না। বললেন, 'নিজে লিখেছ, নিজে জান না!'

'খারাপ লিখি ?' একটু অবাক হবার চেষ্টা করলুম।

'হ্যাঁ গো, অশ্লীল। অশ্লীল লেখ তো ? আমাকে লুকিয়ে লাভ কী ? কি, লেখ না ?'

'বন্ধুরা বলে বটে।'

'বন্ধুরা ?'

'হ্যাঁ, মুখরোচক সমালোচনা করে' আমার নাম যারা প্রচার করছে তাদের বন্ধু বলবো না তো কী ! তাই তো আপনি যে আপনি, আপনি পর্যন্ত আমার নাম শুনেছেন।'

ইঙ্গিতটা দাদা তলিয়ে দেখলেন না, এত ব্যস্ত। ষড়যন্ত্রীর মতো নিম্নস্বরে বললেন, 'আমাকে একখানা দিতে পারো পড়তে ?'

কী বলবো সেই মুহূর্তে কিছু ভেবে পেলুম না।

'তোমার কিছু ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না।'

'জানতে পারলেই বা কী ?' বললুম অনেক কষ্টে, 'সবাই তো জানেই।'

'না, তবু, বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা রয়েছে, একটু সাবধান হয়ে পড়তে হবে বৈ কি।' গোবিন্দপদবাবু চেয়ারটা আমার বিছানার কাছে টেনে আনলেন, অন্তরঙ্গের মতো বললেন, 'ওদের জন্যে তোমার কিছু ভয় নেই, বই আমি ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করে' রেখে দেব।'

গোবিন্দপদবাবুর ছেলে-মেয়েদের জন্যে যেন আমি কতই চিন্তিত এমনি একখানা মুখ করে' বললুম, 'চাবি-বন্ধ করে' রাখলে আর পড়বেন কখন ? এক-আধ সময় বইখানা হাতে নিতে হবে তো ? তখন যদি ওরা কেউ দেখে ফেলে ?'

'ছোঁ মেরে কেড়ে তো আর নিতে পারবে না ? স্পষ্ট বলে' দেব, অশ্লীল বই, ভদ্রলোকের অস্পৃশ্য।'

মনে পড়লো কলেজে এক প্রোফেসর আমাদের একবার দা-ভিঞ্চির ছবি দেখাতে এনেছিলেন। আমাদের হাতে য়্যালবামটা দিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, ৪৮ পৃষ্ঠার ছবিটা দেখো না, ভয়ঙ্কর অশ্লীল। বলা বাহুল্য সর্বাগ্রে আমরা সেই ৪৮ পৃষ্ঠার ছবিটাই দেখেছিলুম এবং আমাদের সহপাঠিনী দুটি মেয়ে বঞ্চিতের মতো মুখ বিমর্ষ করে' বসে' ছিলো দেখে তাদের দিকেও পরে চালান করে দিয়েছিলুম সেই ৪৮ নম্বরের প্লেট।

গোবিন্দপদবাবু নিজের কথার জের টানলেন: 'ছেলেমেয়েদের পক্ষে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ সে তো আগে আমাকেই বিচার করে' দেখতে হবে!'

'তা তো বটেই।' নির্লিপ্তের মতো বললুম।

'তাই, তোমার ভয় নেই, ওদের হাতে আমি পড়তে দেবো না, এমন কি তোমার বৌদিদির হাতে পর্যন্ত না।'

দুষ্টুমি করে' একটু হাসলুম।

গোবিন্দপদবাবু হঠাৎ অলক্ষ্যে আলোড়িত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এত যে ছাই-ভস্ম লেখ শুনি, কী নিয়ে লেখ বল তো?'

'কী নিয়ে আবার! যা থেকে ছাই-ভস্ম হয়, সেই আগুন নিয়ে।'

দাদা দাঁত খোঁচাচ্ছেন আর হাসছেন।

পরে অনুপ্রাণিত হয়ে বললেন, 'নাও, দাও চট করে'। বেশ ভালো দেখে দিয়ো কিন্তু।'

'ভালো!' স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। বললুম, 'এই না বললেন খারাপ বই চান?'

'ঐ আর কি, মানে, খারাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠখানা চাই।'

বুঝলুম দাদার ভালোর অন্তর্থ।

গোবিন্দপদবাবু নিকটের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'এ-সব যে লেখ, বউ-মা আপত্তি করে না ?'

বুঝলুম দাদা ভয়ানক ভুল করেছেন, আর এই ভুলের কারণ দেয়ালে টাঙানো একটি যুবতীর ফটো। কেন না দাদার দৃষ্টি ছবিটার মতোই নিষ্পলক।

বললুম, 'আপত্তি করে' আর কী করবে বলুন। লেখক জেনেই তো ভালোবেসে বিয়ে করেছে।'

'ভালোবেসে !' দাদার মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

কথাটা মোলায়েম করে' দিলুম : 'ভালোবেসে মানে লেখাকে ভালোবেসে।'

'এমন লেখাও কেউ ভালোবাসে নাকি ?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম দাদার দিকে। সে-চাহনির থেকে দাদা সরে' গেলেন। বললেন, 'কদ্দূর করেছে লেখা-পড়া ?'

'ম্যাট্রিকও পাশ নয়। হিতোপদেশ ছেড়েই একেবারে উপনিষৎ !'

একে অশিক্ষিত, তাই লাভ-ম্যারেজ করেছে, তা-ও কিনা এমন একজন বটতলার লেখককে, গোবিন্দপদবাবু আমার সেই কল্পিতা স্ত্রীর প্রতি সরোষ-সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। কী ভেবে ফটোটা রজ্জুমুক্ত করে' পেড়ে আনলেন, তন্ন-তন্ন করে' দেখতে লাগলেন সেটাকে। বললেন, 'এমনিতে দেখতে তো বেশ পরিষ্কার।'

'বিলিতি ফটোগ্রাফারের তোলা, পরিষ্কার হওয়াই তো উচিত।'

'সেই পরিষ্কারের কথা বলছি না। বলছি দেখতে বেশ সুন্দর।'

'ফটোতে সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়। সব কিছুকেই। আমার বাড়িটার যদি ছবি নেন, মনে হবে যেন রাজাট্টালিকায় বাস করছি। এমন কি আপনাকেও ছবিতে ঠিক ভ্যালেন্টিনো মনে হবে।'

যে-কোনো একজন সাহেবের মতো দেখতে হবেন তাইতেই দাদা খুসি। বললেন, 'তা হোক, কিন্তু বৌমাকে আনোনি কেন এখানে? আনোনি বলেই তো গুচ্ছের যতো রাবিশ লিখে চলেছ। নাও, দেরি কোরোনা, বার করো একখানা।'

'খুব ভালো দেখে!' চোখে একটা হাসির ঝিলিক দিলুম।

'হ্যাঁ, সব চেয়ে যেটা ভালো।' গোবিন্দপদবাবুর আবার বিশেষণে ভুল হয়ে গেল।

একটু গম্ভীর হলুম। বললুম, 'কিন্তু দাম?'

দাদার যেন কে গলা টিপে ধরলো। বললেন, 'দাম মানে?'

'দাম মানে মূল্য। বই কিনবেন তার দাম দেবেন না?'

'কিনবো বললুম কই, বললুম, শুধু একটু পড়বো।'

'না-কিনলে পড়তে আপনাকে দেবো কেন? সব-রকম আনন্দেরই দাম দেবেন আর এই পড়ার আনন্দটাই মাগনা?'

গোবিন্দপদবাবু ভর্জায়মান বেগুনের মতো জ্বলে' উঠলেন: 'তুমি বলতে চাও, তোমার এই ট্র্যাশ আমি কিনে পড়বো?'

'আর আপনিই কি আশা করেন আপনার মতো পাঠককে পড়াবো বলে' বই লিখি?'

'তোমার বই যদি পড়ি, তোমার সেটা সৌভাগ্য বলে' মনে করা উচিত।' গোবিন্দপদবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ গোল করে' বললেন, 'কিনে পড়বার বই ঢের আছে বাজারে।'

'হ্যাঁ, বাজারে, আপনার বাড়িতে নয়। কেননা, পাঁজিখানাও আপনি পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনেন।' আমিও বিছানা থেকে নেমে এলুম।

একটা প্রায় হাতাহাতির নমুনা।

সক্রোশে গোবিন্দবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, চট করে' বাস্কেটের ডালা খুলে রঙচঙে-মলাটের একখানা আধমোটা বই বার করে' ধরলুম। হাসি-মুখে বললুম, 'আশ্বস্ত হোন, কিনতেও হবে না, ফেরাতেও হবে না, বইখানা আপনাকে আমি উপহার দিচ্ছি।'

রাগান্বিত মুখে পুরুষের হাসিটা ভালো দেখায় না। অন্তত রাগটা শেষ হতে না দিয়েই দ্রুত হেসে ওঠাটা ভারি কুৎসিত। বুঝলুম, বইয়ের থেকে বইয়ের জ্যাকেটটা দেখেই গোবিন্দপদবাবু আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। প্রকাশকের রুচি যেমন বন্য, জ্যাকেটের উপরে তেমনি একটি বন্য নারীমূর্তি।

প্রভাত দেখেই দাদা মধ্যাহ্নটা বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'এটা কী ?'

বললুম, 'জ্যাকেট।'

দাদা নিজের মনেই রসিকতা করে' উঠলেন: 'কোনদিন আবার বইয়ের শুনবো পেটিকোট। কিন্তু ভায়া, প্রেজেন্ট করেই তো মুস্কিলে ফেললে। এখন এটাকে লুকোই কোথায় ?'

'কেন, খবরের কাগজের একটা স্কার্ফ দিয়ে জ্যাকেটটা চাপা দেবেন।'

'সে তো বাইরেটা। কিন্তু ভিতরটা তো আর ঢেকে রাখতে পারবো না। প্রেজেন্ট নেয়া মানেই তো এটাকে চিরস্থায়ী করে' রাখা।' দাদা বিশেষ ভাবিত হয়েছেন দেখলুম। বললেন, 'কোনো-না-কোনো ফাঁকে ছেলেমেয়েগুলো ঠিক পড়ে' ফেলবে দেখো।'

'অতদিন ওটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না, আপনার পড়া হয়ে গেলেই ওঁ স্বাহা বলে' ভস্মসাৎ করে' ফেলবেন।'

'ঠিক বলছ ?'

'হ্যাঁ। কেননা বেঁচে থাকলে আপনার ছেলেমেয়েরাই একদিন নিজের থেকে পড়ে' নিতে পারবে। বই প্রেস থেকে আসে, একখানা গেলে কী হয়? ছেলেমেয়েরা তো আর প্রেস থেকে আসে না।'

'ঠিক বলছ? পড়ে পুড়িয়ে ফেলবো?'

'নিশ্চয়ই। আপনাকে যখন দিয়েছি, তখন তো ভস্মেই দিয়েছি।'

এততেও দাদা হাসলেন। বললেন, 'দাও, বেঁধে দাও বইটা।'

জ্যাকেটের উপর একটা স্কার্ফ চাপিয়ে দিলুম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে বললেন, 'বৌমাকে শিগগির নিয়ে এসো। একা থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়।'

২

না, একা থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়।

দিন কতক পরে, আরেক বিকেলবেলা, সঙ্গীর অভাবে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আয়নাতে নিজের মুখ দেখছি, হঠাৎ কার ছায়া পড়লো। বেশ একটি লীলায়িত ছায়া।

সেটা স্বপ্ন, কেননা আবির্ভূত হলেন মধুসূদন, আমার চাকর ও একমাত্র পৃষ্ঠপোষক।

বললে, 'গোবিন্দপদবাবুর বড়ো মেয়ে এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

মেয়ে, তায় বড়ো মেয়ে, তায় গোবিন্দপদবাবুর বড়ো মেয়ে—ব্যাপারটা কেমন হতভম্ব করে' দিলে। যেন ভালো করে' শুনতে পাইনি এমনি অমনোযোগের থেকে জিগগেস করলুম, 'কে?'

'আমি।' দ্রুত পায়ে একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো: 'নমস্কার।'

আশ্চর্য, আমার আয়নাটা তা হ'লে মিথ্যা কথা বলেনি।

'আমার নাম ব্রততী, এই রাস্তার মোড়েই আমাদের বাসা, আমার বাবার নাম শ্রীগোবিন্দপদ—'

'কী আশ্চর্য, বসুন, বসুন এই চেয়ারটায়।' ক্ষিপ্রহস্তে একটা চেয়ার টেনে দিলুম। ভাবলুম, মধুসূদন ঘরের থেকে চলে' যেতেই ভাবলুম, আমি কি বাস্তব জগতে আছি, না এটা কোনো একটা উপন্যাসের পৃষ্ঠা!

মেয়েটি বসলো। স্নিগ্ধ হেসে বললে, 'আশ্চর্য তো হয়েছি আমরা। আপনি, এত বড়ো একজন সাহিত্যিক, আমাদের এত কাছাকাছি আছেন, অথচ জানতে দেননি একটুও। এত আত্মগোপন কি ভালো?'

কার বেশি আশ্চর্য হবার কথা তা নিয়ে তর্ক করে' লাভ নেই। তক্তপোষের একধারে বসে' বিনীত গলায় বললুম, 'আজ তবে কী করে' জানলেন আমি এখানে, এই রাজবেশে?'

'বাবার টেবলে আপনার একখানা বই দেখলুম আজ।'

'আমার বই? বলেন কী?'

'হ্যাঁ, আপনার লেখা বই—"বহ্নিমতী"। কি, আপনার নয়? আপনি লেখেন নি? আপনার নামের আর কোনো ভদ্রলোক তার লেখক?' ব্রততী প্রায় ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় আর কি।

না লিখলেও, লেখকত্ব মেনে নিতে হতো, এমন তাড়া। তাই সবিনয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আমিই সেই বহ্নিমান।'

ব্রততীর সঙ্গে ছোট্ট একটি চোখ চাওয়া-চাওয়ি হলো। একটু নড়ে'-

চড়ে বসে' অন্যদিকে চেয়ে সে বললে, 'দেখে তো নিতান্ত ভালোমানুষের মতোই মনে হয়!'

'সেইটেই আমাদের দুর্ভাগ্য যে অন্য-কিছু আশা করেন, কিন্তু হ'তে পারি না। এই জন্যেই আমরা আশা করি না কোনো ভক্তের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়।' কথার দুঃসাহসটা হাসি দিয়ে প্রচ্ছন্ন করলুম।

ব্রততীর ঠিক জায়গায় লেগেছে দেখলুম। ভুরু কুঁচকে সে জিগগেস করলে: 'কী করে' বুঝলেন আমি আপনার ভক্ত?'

'ময়ূরের পেখম দেখে যেমন বুঝি আকাশে মেঘসঞ্চার হয়েছে। উপমাটার জন্যে মার্জনা করবেন, লেখক বলে' ভাষার একটুখানি প্রশ্রয় চাই। সাহিত্যিক জেনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন এটার মধ্যে আমার লেখার প্রতি আপনার এতটুকু মোহও কি কল্পনা করতে পারি না?'

'না।' ব্রততী কঠিন গলায় বললে, 'আমি আপনার লেখার একজন তীব্র নিষ্ঠুর সমালোচক। আপনার লেখা আমি একদম পছন্দ করি না। অমন করেই বা বলি কেন? আপনার লেখা আমি ভীষণ ঘৃণা করি।'

'ধন্যবাদ। সে-ঘৃণাও ভক্তিরই উপসর্গ।'

'রাবিশ!' ব্রততী মুখ ফেরালো। পরমুহূর্তে চোখ বড়ো করে' বললে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে নতুন আলাপ করতে এসেছি আপনাকে কে বললে?'

'আলাপ করতে আসেন নি?' কেমন অসহায় বোধ করলুম।

'না। আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। কি, চিনতে পারলেন না?' বলেই ব্রততী শব্দ করে' হেসে উঠলো।

ভীষণ ফাঁপরে পড়লুম, তার চেহারা দূরের কথা, নামটা পর্যন্ত

মনে করতে পারি না। জীবনের ধূসর দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়েও শ্যামলিমার আভাস পাওয়া গেল না, অথচ হাতের কাছের জলকেও মরীচিকা বলে' তাড়িয়ে দিতে মায়া করে। নিজে বলছে এতদিনের আলাপ, অথচ আমি গোঁয়ারের মতো সেটা অস্বীকার করবো? এই বা কোন দিশি সৌজন্য?

তবু, বিবেকের কামড়ে বোকার মতো মাথা চুলকোতে লাগলুম। বললুম, 'কি-জানি কখন—'

'কি-জানি কখন নয়, আজ দু'বৎসর আপনার সঙ্গে আলাপ।' দু'চোখে উজ্জ্বল কৌতুক নিয়ে ব্রততী বললে, 'এমন কি, গঙ্গার উপর, ইস্টিমারে, এক টি-পার্টিতে, সন্ধ্যেবেলায়—'

'হবেও বা।' স্পষ্ট অস্বীকার করতে জোর পাচ্ছিলুম না।

'আশ্চর্য, অমন আশ্চর্য সন্ধ্যার কথা আপনার মনে নেই? আমি অন্তত ভেবেছিলুম,' হাসির দমিত আভায় সুকোমল ব্রততীর কণ্ঠস্বর: 'সেই স্মৃতির সূত্রে আজ অন্তত এক পেয়ালা চা আমাকে অফার করবেন।'

'খাবেন আপনি চা?'

'অন্তত বাবা যদি এসে দেখেন আপনার এখানে বসে' চা খাচ্ছি, তবেই ছবিটা সম্পূর্ণ হবে।'

'আপনার বাবা!' কেন না-জানি চম্‌কে উঠলুম।

'কেন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় নাকি?' ব্রততী তির্যক দৃষ্টিক্ষেপ করলে।

লজ্জিত হলুম বা লজ্জিত হবার ভান করলুম। বললুম, 'তিনি আসবেন নাকি এ-সময়?'

'আসাই তো উচিত। কেননা আমি বলে' এসেছি, আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি, বহুদিনের বন্ধুতাটা একবার ঝালিয়ে নিতে। আমি যদি

বাপ হতুম আর আমার মেয়ে যদি অবাধ্য হতো, মানে প্রগতিবাদিনী হতো, তবে তাকে ঠেকাতে না পারলেও তার বন্ধুকে অন্তত ঠেকাতুম। তৃতীয় চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসে' থাকতুম সামনে।' কথা কয়টা ব্রততী রাগে বলল না রসিকতায় বলল বোঝা গেল না।

ও-কথার উত্তরে যা বলা যায় তাই আমি বললুম। বললুম, 'পিতৃদেবের অবাধ্য হয়েছেন নাকি?'

'কাজেকাজেই। কই, চা-টা দিন চট করে'।' এবার স্পষ্ট রাগ।

'দিচ্ছি। কিন্তু কী হয়েছে আগে বলুন। গরম চা-ই তো খাবেন, নিজে একটু জুড়িয়ে নিলে ক্ষতি কী?'

'বলবো বলেই তো এসেছি। তবে শুনুন।' ব্রততী মুখে শীর্ণ করে' একটু হাসি টানলো, টান হয়ে বসবার চেষ্টা করলো ও বললে:

'বিকেলবেলা ঘুরে-ঘুরে চুল বাঁধছি, দেখি বাবার টেবলের উপর রঙচঙে মলাটের একটা বই। টেবলের উপর যেখানে পঞ্জিকা আর উপনিষৎ পারিবারিক চিকিৎসা আর বেঙ্গল টেন্যান্সি য়্যাক্ট, সেখানে বইটা নিতান্ত বেমানান লাগলো। হাতে নিয়ে দেখলুম, "বহ্নিমতী," আপনার লেখা। বেণীটা আলগা হয়ে এলো, বইটা তক্ষুনি পড়তে বসলুম। সদ্য-প্রকাশিত আপনার এই বইটাই শুধু পড়িনি।'

'আর-সব পড়েছেন?' টিপ্পনি না কেটে পারলুম না।

'সমস্ত। কোনটার পর কোনটা, কাকে কোন বই উৎসর্গ করেছেন, কোন বইয়ে কি-কি চরিত্র, নায়ক-নায়িকা থেকে চাকর-ঝি পর্যন্ত সব আমি নাম-ধাম অবিকল বলে' দিতে পারি। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করুন।'

'সিনেমার যুগে এটা প্রায় রোমাঞ্চের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা শুধু জিগগেস করবো যদি কিছু মনে না করেন।'

'করুন।'

'একখানা বইও কি কিনে পড়েছেন ?'

অনর্থক আঘাত করলুম। কিন্তু ব্রততী আহত হলো না। বললে, 'কিনে পড়িনি তা ঠিক, কিন্তু আপনার এ-বই আমি কিনবো। বলতে কি, তাই কিনতেই আমি এসেছি। আছে তো আপনার কাছে ?' বলে সে কোন অদৃশ্য নেপথ্য থেকে ছোট একটি মনি-ব্যাগ বার করলো।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকার চমকালুম। বললুম, 'কিনবেন ?'

'হ্যাঁ, না কিনে তো আর উপহার পাবো না! আর কিনবো যে, আপনার স-স্বাক্ষর কিনবো, মানে অটোগ্রাফ-সহ। এবং তাতে যা আমি বলবো তাই আপনাকে লিখে দিতে হবে। ভয় নেই, তারো দাম দিতে আমি প্রস্তুত। ভয় নেই, এমন কিছু লেখাবো না যাতে আপনার মর্যাদার হানি হতে পারে, আর আমার কাছে আপনার চেয়ে আমার মর্যাদার বেশি দাম।' বলতে-বলতে সত্যিই সে টাকা বার করলো।

বাধা দিয়ে বললুম, 'ব্যস্ত হবেন না। আগে সবটা শুনি। হাঁ, পড়তে বসলেন—তারপর ?'

'তারপর,' ব্রততী বলতে সুরু করলো, উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত নাটকীয়তা প্রয়োগ করে': 'পিছন থেকে বাবা এসে হঠাৎ হাঁকলেন, কী পড়ছিস রে ওটা ? বলেই ছোঁ মেরে হাত থেকে কেড়ে নিলেন বইটা। যেন চুরি করতে এসে সিঁধের মধ্যে সবে মাথা গলিয়েছি অমনি একটা লাঠির বাড়ি পড়লো। অমন জোরে ছিনিয়ে নিলেন বইটা, এই দেখুন, এই চুড়িটাতে কেমন কেটে গিয়েছে!' কাটার চিহ্নটা দেখলুম কিনা নজরে পড়লো না, একটি স্বল্প-উত্তোলিত সুগোল মণিবন্ধ দেখলুম।

বললুম, 'ভাগ্যিস পড়েন নি বইটা।'

'কে বললে পড়িনি?'

'ঐ যে বললেন আগে!'

'বলেছি নাকি?' ব্রততী মৃদু হাসলো: 'কিন্তু বাবার কাছে তা স্বীকার করলুম না। তাঁকে বললুম, এইবার নিয়ে আমার ত্রয়োদশ বার পড়া হতো। তিনি তো অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলেন, আমাকে আর বাঁচাতে পারলেন না। বললুম, বি-এ ক্লাশে যারা পড়ে তারা এর চেয়েও অনেক খারাপ বইই পড়ে, পড়তে হয়।'

বি-এ ক্লাশ শুনে নয়, সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো বলেই সুইচ টেনে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালালুম। বললুম, 'তিনি কী বললেন?'

'বললেন, বারো বার পড়েছিস? বলে' যা-নয় তাই বলে' আমার অধোগতির একটা লুরিড বর্ণনা দিলেন। ঝোঁকের মাথায় মুখের উপর বলে' বসলুম—কিন্তু, আমার চা কই?'

সাহস সঞ্চয় করে' বললুম, 'আপনার জন্যে যে চা সেটা চাকরের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। তাই ভাবছি—আপনার গল্প শেষ হয়ে গেলে আপনাকেই অনুরোধ করবো চা-টা তৈরি করে' নিতে।'

'চমৎকার আতিথেয়তা!' ব্রততীও সাহসিক হাসিতে বললে, 'তা হলে একা নিজের জন্যেই ঠিক এক পেয়ালা?'

'আপনি যদি নিজেকে এখন একা মনে করেন তবে তাই।'

ব্রততী হঠাৎ উছলে উঠলো। চঞ্চল হয়ে বললে, 'ভালোই তো হবে দেখতে! আপনার চাকরকে বলুন গরম জল-টল পেয়ালা-ফেয়ালা সব নিয়ে আসতে। ঠিক একটা বালিগঞ্জী উপন্যাসের আরম্ভের মতো দেখাবে—যদিও শেষটা জানি নিমতলা।'

শেষের ইঙ্গিতটা বুঝতে চাইলুম না। মধুসূদনকে বললুম যা বলবার।

'হ্যাঁ, তারপর, কী বললেন ঝোঁকের মাথায় ?'

'একটু বেশি বলে' ফেললুম। বলে' ফেললুম, বই পড়তে দিচ্ছেন না কী! যে লোক লিখেছে এই বই, তার সঙ্গেই তো আমার আলাপ—কত দীর্ঘ দিনের আলাপ !'

শেষের কথাটায় অনেক অর্থ ছিল, কিন্তু আমি সেখান দিয়ে গেলুম না। বললুম, 'তা হলে বলতে চান, লেখা খারাপ হলে লেখকও খারাপ হতে বাধ্য ? যে নাস্তিক সে কাজে-কাজেই অসাধু ?'

'জনমত তাই। যার জেল হয় সেই হয় দোষী। তাই হাতে-হাতে ফল পেলুম। যদি বলতুম একটা বাঘ কি বনমানুষের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আলাপ করে এসেছি বাবা ততটা চমকাতেন না। আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, কোথায় ? কী করে ?'

কী বলবো খুঁজে পেলুম না। ভয়ে-ভয়ে তাকালুম ওর মুখের দিকে।

'লিখতে পারি না, কিন্তু বানিয়ে বলতে পারি চমৎকার।' তপ্ত, ঈষৎ আরক্ত মুখে ও বললে, 'শেষকালে স্টিমার-ট্রিপের গল্পটা বলে' ফেললুম।'

'মাসটা আষাঢ়—'

'তাই গল্পটাও আষাঢ়ে।' ব্রততী হাসলো।

'তিনি কী বললেন ?'

'বললেন, মিথ্যা কথা। আপনার নাম করে' বললেন, দু'বছর ধরে' ও এখানে। কিন্তু আপনি সবে এখানে তিন মাস, আমি বললুম। এই দু'বছরে কবার উনি ছুটি নিয়েছিলেন তার আপনি কী জানেন ?'

'অত্যন্ত ভীতিপ্রদ প্রশ্ন।'

'সুতরাং আমাকে এখন আর আপনার চা না-খাইয়ে গত্যন্তর নেই। জ্যামিতিক উপায়ে বন্ধুত্বটা সপ্রমাণ করা দরকার।'

কাঠের বারকোষে করে’ মধুসূদন সুমুহূর্তে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো। জ্যামিতিক নিয়মে সেটাকে রাখলো একটা বেতের টিপাইয়ের উপর আর ওপারে ব্রততীর মুখোমুখি আরেকখানা চেয়ার রাখলো। একটু ঘুরে বসে’ বান্ধবিক তৎপরতায় ব্রততী পিরিচ-চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া সুরু করলে।

সেই অবসরে কমলার ফটোটা আমি ফের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে গেলুম।

ব্রততী অবহিত হয়ে একটু-বা বিরস গলায় বললে, ‘ওটা কার ফটো ?’

‘অনুমান করুন !’

‘অনুমান করবো কি, আমি যে ওকে চিনি।’ ত্বরিত ভঙ্গিতে ব্রততী উঠে এলো : ‘ও তো কমলা। মরে’ গেছে। তাই নয় ?’

‘তাই। আপনি ওকে চিনলেন কী করে ?’

‘বা, আমাদের সঙ্গে পড়তো যে বেথুনে। আপনি ওকে চিনলেন কী করে’ সেইটে তো আমার প্রশ্ন। আমি যতদূর জানি, ওর তো বিয়ে হয় নি।’

‘না। বিয়ের সব প্রায় ঠিক হয়েছিলো, এমন সময় টাইফয়েডে মারা গেল।’

‘আমরা শুনেছিলুম টি-বিতে। কিন্তু,’ ব্রততী আমার চোখের উপর চোখ ফেললো : ‘কার সঙ্গে বিয়ে হবে ঠিক হয়েছিলো শুনতে পাই ?’

‘তাকে আপনি চিনবেন না।’

‘তবু নামটা বলতে আপনার আপত্তি কী ?’

‘প্রশান্ত নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমারই এক বন্ধু। এই সেদিন তার বিয়ে হয়ে গেল, নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম।’

নামটা যে আমার নয়, শুনে ব্রততী হয়তো একটু আশ্চর্য হলো। বললে, 'তবে ও আপনার কে ?'

'অনুমান যখন করতে পারছেন না, তখন বলি, ও আমার ছোট বোন।'

'বোন ! তাই বলুন। আমরা শুনেছিলুম—'

কী শুনেছিলো জিজ্ঞাসা করলুম না। মনে হলো ফটোর থেকে কমলা হাসছে।

হালকা পায়ে ব্রততী তার চেয়ারে গিয়ে বসলো। সামান্য একটু নিচু হয়ে চা ঢালতে-ঢালতে বললে, 'তবে তো আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুতার একটা দাবি আছে। কমলার সঙ্গে আমার ভয়ঙ্কর ভাব ছিলো।'

সঙ্ক্ষেপে বললুম, 'হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর ভাবগুলি মোটেই স্থায়ী হয় না।'

সস্মিতমুখে ব্রততী বললে, 'কিন্তু আপনার সম্পর্কে ভাবটা অত ভয়ঙ্কর না করলেও চলবে।'

'কেননা কমলার সম্পর্কে আপনিও আমার ছোট বোন।'

রসাভাস করলুম কিনা বুঝলুম না। কিন্তু তেমনি হাসিমুখেই ব্রততী বললে, 'আমেন্! বাঁচিয়ে দিলুম আপনাকে।'

এর পর, স্বভাবতই, খানিকটা স্তব্ধতা উপস্থিত হলো। এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যেই আমরা চা খাওয়া সুরু করলুম।

কিছু একটা বলা দরকার বিবেচনা করে' বললুম, 'কই, আপনার বাবা তো এলেন না।'

নিচু হয়ে নিঃশব্দে এক চুমুক চা খেয়ে ব্রততী বললে, 'দেখছি না তো। বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন। কিন্তু আর ভয় কি,' চোখ তুলে আমার দিকে সে তাকালো : 'আমিই গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মেল ট্রেনের ঘণ্টা দিয়েছে, পেয়ালার জন্যে জানলার কাছে লোক

আছে দাঁড়িয়ে, এমনি তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সাঙ্গ করে' ব্রততী উঠে দাঁড়ালো। করজোড় করে' বললে, 'নমস্কার। এবার আমি পালাই।'

অনেক কথাই তাকে মনে করিয়ে দেয়ার ছিল, তার বই কেনা, আমার অটোগ্রাফ লিখে দেয়া এবং তুজনের নিমতলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু তক্ষুনি যা জরুরি বলে মনে হলো তা হচ্ছে নিচে, সদর-দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসা!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ব্রততী বললে, 'যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ করে' খুসি হলুম।'

'আলাপ করার চেয়ে আলাপ ভালো লিখতে পারি হয়তো।'

'কি জানি, পড়বার কোনোদিন সৌভাগ্য হয়নি।' অত্যন্ত নির্ব্যক্তিক গলায় সে বললে।

তারপর আমাকে মুহূর্তমাত্র বিস্মিত হবার সময় না দিয়েই সে ফের বললে, 'চলুন না, আমাকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন।'

সেইটেই শিষ্টাচার হতো, সন্দেহ কী। কিন্তু কোনোক্রমে চিহ্নিত হই, মফস্বলে সেটা আমাদের একটা বিভীষিকা। সুতরাং ভীরুতার বদলে বিনয় প্রকাশ করে' বললুম, 'একা এসেছেন একা যাওয়াটাই কি ঠিক নয়?'

'আমেন্!' একটু টেনে কথাটাকে উচ্চারণ করে ব্রততী রাস্তায় নেমে গেল।

২৮৯০

৩

ব্রততীই তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে, পরদিন সন্ধেবেলা গোবিন্দপদবাবু এসে আবির্ভূত হলেন। যেটা প্রায় অভূতপূর্ব, দাদার মুখমণ্ডল ভারি প্রসন্ন মনে হলো।

'কী চমৎকার লিখেছ ভায়া!' দাদা চেয়ার টেনে বসে' পড়লেন: 'ডিটেকটিভ উপন্যাস কোথায় লাগে। সেই এককালে পড়েছিলুম নীলবসনা সুন্দরী, আর এতদিন পরে তোমার এই বইখানা। কী যেন নাম রেখেছ বইয়ের?' কাঠগড়ায় সাক্ষীর মত কান চুলকোতে-চুলকোতে দাদা বললেন, 'দাঁত-ভাঙা কী যে তোমাদের আজকাল বাঙলা হয়েছে!'

কোনোই অপরাধ নিলুম না। বললুম, 'পড়েছেন সবটা?'

'তা এখনো শেষ হয়নি বটে! লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়তে হচ্ছে তো।'

'সবটা না পড়েই বুঝলেন চমৎকার?'

'বোঝা যায় হে বোঝা যায়!' দাদা বিজ্ঞের মতো চোখ দুটো একটু গোল করলেন: 'সাক্ষীর ভাব-ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ব্যাটা সত্যি কথা বলছে কিনা। এত বয়েস হলো, এখনো লোক চিনতে পারি না হে?'

বললুম, 'চমৎকারই যদি বুঝে থাকেন, তবে লুকিয়ে পড়ার দরকার কি!'

নিজের যুক্তিতে নিজেই ঘায়েল হয়ে দাদা খানিকটা অপ্রতিভ হলেন। সে-ভাবটা দূর করবার জন্যে সবেগে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, কিচ্ছু দরকার নেই। না, আর দরকার কী! সত্যি, দরকার কিসের!'

দাদা পা দোলাতে-দোলাতে সূক্ষ্ম একটু হাসলেন।

পাছে হাসির ভাবার্থটা না বুঝি তাই তিনি একটু পরিষ্কার হলেন। বললেন, 'ব্রততী তো আগেই পড়েছে।'

যেন কিছুই জানি না এমনি একখানা নির্লিপ্ত মুখ করলুম।

'কি, চিনতে পারলে না ব্রততীকে? আমার মেয়ে, বড়ো মেয়ে। এ-বছর বি-এ দেবে।'

'ও, হ্যাঁ।' কথাটা এমনভাবে বললুম যেন ইতিহাসের খুব একটা জানা তথ্যের পুনরাবৃত্তি করছি।

আমার স্বরের শৈত্যটা দাদাকে স্পর্শ করলো। তিনি ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'কেন, কাল আসেনি সে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে?'

'ও, হ্যাঁ, এসেছিলো।' যতটা উৎসাহ প্রকাশ করা দরকার ততটা পারলুম না প্রকাশ করতে।

'তারপর দু'জনে লিটারেচার নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলে নাকি। চা খেলে—'

'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছি, উপযুক্ত কিছুই অভ্যর্থনা করতে পারলুম না। আপনার বাড়িতে গেলে কত নিশ্চয়ই খাওয়ান, কিন্তু আমি শুধু এক পেয়ালা চা দিয়েই বিদায় করলুম। বুঝতেই পাচ্ছেন, গিন্নি কাছে নেই, তাই কী অসুবিধে!' শব্দ করে' একটা নিশ্বাস ফেললুম।

'বাঁদরামি রাখো।' গোবিন্দপদবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। পরে ঢোক গিলে বললেন, 'এক পেয়ালা চা-ই যথেষ্ট। যা দিনকাল পড়েছে, ঐ ঢের। খরচ কমাতে শেখ। এই বয়েস থেকে মিতব্যয়িতা না শিখলে পরে যে হালে পানি পাবে না। আমি তো শুধু একখিলি পান দিয়ে ভদ্রতা রাখি। পান না খাও, কিছু সুপুরি। সুপুরিও খাবে না, তবে অন্তত দাঁতে একটা লবঙ্গ কাটো।'

দাদার হিতোপদেশটা মনে-মনে সম্ভোগ করছি, হঠাৎ তিনি আমাকে একটা কুড়োলের ঘা মারলেন। বললেন, 'কেমন দেখলে ব্রততীকে ?'

ধাঁধিয়ে গেলুম প্রথমটা, প্রশ্নটা এমন খোলসা। বললুম, 'কেমন দেখলুম মানে ?'

'মানে, প্রথম আলাপ, কেমন ইমপ্রেশন হলো তোমার ?'

বোকার মত চুপ করে' থাকলুম।

দাদা আরো প্রাঞ্জল হলেন: 'মানে, ইংলিশে ও অনার্স নিয়েছে—তাই জিগগেস করছিলুম—লিটারেচার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেছিলে দুজনে—কেমন বুঝলে, সেকেণ্ড ক্লাশ অন্তত একটা পাবে কিনা।'

তবু সন্দেহ ঘুচলো না। সাহস সঞ্চয় করে' বললুম, 'এই প্রথম আলাপ, কী করে' জানলেন ?'

'প্রথম নয় ?' গোবিন্দপদবাবু লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, তাঁর এই আস্ফালনের মধ্যে প্রতিবাদের চেয়ে প্রফুল্লতাই যেন বেশি।

'না, ওর সঙ্গে আমার দু'বছরের আলাপ।'

'দু'বছরের!'

'হ্যাঁ। কেন, বলেনি আপনাকে ?'

'কই, না তো!' গোবিন্দপদবাবু কান চুলকোতে লাগলেন।

মাথাটা ঘুরে গেল। বললুম, 'কেন, বলেনি আপনাকে, গঙ্গার উপর এক স্টিমার-পার্টিতে দু'বছর আগে আমাদের আলাপ হয়েছিলো ? ছুটি-ছাটায় কোলকাতায় গিয়ে—'

আমাকে বাধা দিয়ে গোবিন্দপদবাবু হাসিমুখে বললেন, 'বলা উচিত

ছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু বলেনি। এতে রাগের কিছুই নেই, কেননা বাপের কাছে মেয়েরা কি সব কথা খুলে বলতে পারে? যাকগে, সে তো ভালো কথাই, অনেক দিনের আলাপ। কিন্তু যাকগে, মোট কথা, ওকে তুমি কেমন বুঝছ?'

তবু, সন্দেহ-নিরসন না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলুম না। বললুম, 'আগে থেকে আলাপ, এমন কোনোই কথা হয়নি? আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য কিসের!'

'একদম অনাত্মীয় অপরিচিতের বাড়িতে তাকে আসতে দিলেন?'

'দিলুম বৈ কি। ও যে তোমাকে চেনে, ভীষণ চেনে। জানো না তো, ও একজন ভোরেশ্যাস রিডার—তোমার সব বই ওর পড়া, প্রায় মুখস্ত। হিস্টি্র মতো সন-তারিখ পর্যন্ত বলে' দিতে পারে।'

'থাক।'

'থাক নয়, সত্যি। বেশ, চলো আমাদের বাড়ি, দেখবে।' বলে' হঠাৎ তিনি ছেলেমানুষের মতো আমার হাত ধরে' টানাটানি সুরু করলেন।

হাত ছাড়িয়ে নিলুম। বললুম, 'চেনে তো বই পড়ে চেনে। কিন্তু সেইটেই কি যথেষ্ট ছাড়পত্র—যখন আপনি জানেন সম্প্রতি আমার গৃহিণী এখানে অনুপস্থিত। আমি তো ভেবে কাঠ হয়ে যাচ্ছি, আপনি কি করে তাকে সজ্ঞানে অনুমতি দিলেন? আপনার মাথায় আকাশটা ভেঙে পড়লো না?'

'আর তোমার মাথায় আকাশটা ভেঙে পড়লো না যখন তুমি বলছ যে তুমি বিয়ে করেছ?'

জানতুম, এমনিভাবেই প্রশ্নটা প্রত্যর্পিত হবে। বললুম, 'কিন্তু সে তো ব্রততী আপনাকে পরে গিয়ে বলেছে। কিন্তু ওর আসবার সময় তো তা আপনি জানতেন না।'

'জানতুম হে জানতুম।' গোবিন্দপদবাবু সূক্ষ্ম ভ্রূকুটি করলেন: 'যেটুকু জানতুম না, সেটুকু এখন জানলুম তোমার কাছে।'

'ঘটনাটা কী ঘটেছিলো কাল সন্ধেবেলা, আমাকে বলবেন পরিষ্কার করে? মানে, সত্যি করে?'

'বলবো বৈ কি, যেহেতু কালকের ঘটনাটাই জানি।' গোবিন্দপদবাবু হাসলেন: 'দু'বছর আগের স্টিমার-পার্টির কথা তো আর জানি না।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'হয়েছিলো কি, শোনো—'

'হ্যাঁ, একটুও অতিরঞ্জন করবেন না। Bare facts.'

'হ্যাঁ হে হ্যাঁ, অতিরঞ্জন করবো কোত্থেকে? আমি কি প্রেমিক না সাহিত্যিক?' গোবিন্দপদবাবু আরম্ভ করলেন: 'হয়েছিলো কি, আমি গিয়েছিলুম একটু বাইরে, ফিরে এসে দেখি, বন্ধ ড্রয়ারের থেকে তোমার সেই বইটা খুলে নিয়ে ব্রততী পড়ছে—'

কোথায় যেন বাধলো, তাই বাধা দিলুম: 'বইটা টেবিলের উপর পড়ে ছিল না? ব্রততী তবে নিজে চাবি লাগিয়ে ড্রয়ার খুললো? কি করে' ও জানলো যে ড্রয়ারে বই আছে?'

'আরে বাপু, ও-ই হয়েছে। আমি কি আর দেখতে গেছি কোত্থেকে পেলো ও বইটা? মোট কথা, এসে দেখলুম বইটা ও পড়ছে। হলো?'

'বেশ। পড়ছে। তারপর?'

'তারপর, ঠাহর করে' দেখলুম, তোমারই সেই বই। বুঝলে কিনা, প্রথমটা খুব রাগ করে' উঠলুম। বললুম, খবরদার ছুঁসনে ও-বই। একেবারে অখাদ্য। ঐ আর-কি। মোট কথা, খুব একচোট নিন্দে করলুম তোমাকে। আর ওকে শাসন করে' দিলুম তোমার লেখা বই

যেন ও কোনোদিন না পড়ে।' গোবিন্দপদবাবুর মুখ ভারি শুষ্ক ও শোকার্ত দেখালো।

বললুম, 'কেন, এই না বললেন, চমৎকার বই, তবে ও পড়বে না কেন?'

'আহা, তখন তো আর সবটা পড়ে' দেখিনি।'

'সবটা তো এখনো পড়ে' দেখেন নি। আচ্ছা, হলফ করে বলুন, কাল সন্ধেবেলা যতটুকু আপনার পড়া ছিলো তার এক লাইনও বেশি আপনি আজ পড়েছেন?'

'কী মুস্কিল, তুমি আমাকে জেরা করবে নাকি? তার চেয়ে ওঠো, আমার বাড়িতে চলো।' দাদা আবার আমার হাত ধরে' টানতে লাগলেন: 'সেখানে তুতু, মানে ব্রততী, তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে। চলো, ওঠো।'

'উঠছি। কিন্তু আগে আমার কথার উত্তর দিন। অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। তারপর পড়েছেন এক ছত্র?'

'না। আর সময় পেলুম কোথায়?'

'তবে, কাল যা অত্যন্ত অখাদ্য ও নিন্দনীয় ছিল, আজ অপরাহ্ণে হঠাৎ তা এমন চমৎকার হয়ে উঠলো কী করে?'

'বা, আমি মত বদলাতে পারবো না?' গোবিন্দপদবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু গলায় একটুও ঝাঁজ আনলেন না: 'এ কী জুলুম তোমার! সুরেন বাঁড়ুয্যে মত বদলায়নি? র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড মত বদলায়নি? মত না বদলালে সূর্যই তো আজ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াতো।' গোবিন্দপদবাবু নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকলুম। পরে বললুম, 'হ্যাঁ, তারপর, নিন্দা শুনে ব্রততী কী বললো?'

'স্রেফ জ্বলে উঠলো।' সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দপদবাবুর গোলাকার চক্ষুদুটিও জ্বলে উঠলো : 'বললে, তোমার মতো ব্রিলিয়্যাণ্ট রাইটার এ-দেশে এ-যুগে জন্মায়নি। তারপরে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বলে কিছু নেই, যা আছে তা নাকি আর্টিস্টিক আর ইন-আর্টিস্টিক। যা আসলে অশ্লীল তা-ও নাকি শ্লীল করে,' মানে আর্টিস্টিক করে' লেখা যায়। এই বলে' তোমার ব্রিফ নিয়ে পোর্শিয়ার মতো ব্যারিস্টারি করতে লাগলো। আমার কোনোকালে অনার্স-ফনার্স ছিলো না, টায়েটুয়ে কোনোরকমে পাশ করে' গেছি—সাপ আর ব্যাঙ, সাহিত্যের কিছুই বুঝি না ছাই!'

'তা না বঝুন, কিন্তু ওর হাত থেকে বইটা আপনি সজোরে কেড়ে নিয়েছিলেন?'

'ককখনো না।'

'এমন জোরে কেড়ে নিয়েছিলেন যে, চুড়িতে ওর হাতের কব্জিটা খানিক কেটে গিয়েছিলো।' ওঁর ব্যবহারে ভীষণ প্রতিবাদ করছি, যেন এমনিই শোনালো কথাটা।

'পাগল! অত বড়ো মেয়ের গায়ে আমি হাত তুলবো? কেন,' কী সন্দেহ করে' গোবিন্দপদবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন : 'কেন, ও তোমাকে তাই বলেছে নাকি?'

উত্তর দিলুম না।

গোবিন্দপদবাবু স্বগতোক্তি করলেন : 'পাগলি! তোমাকে একটু কী মন্দ বলেছি তায় মেয়ের অভিমান হয়েছে। মনে এমন লেগেছে যে মনে করেছে শরীরে লেগেছে। পাগলি আর কাকে বলে?'

বললুম, 'তারপর কী হলো?'

'তারপর আরো সে তোমার প্রশংসা করলো। তুমি কত বড়ে

লেখক তা হয়ে গেছে, এখন, তুমি কত বড়ো ছাত্র—তা নিয়ে। প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছ, ভারি-ভারি গোল্ড-মেডেল পেয়েছ, স্কলারশিপ পেয়েছ—সেই কাহিনী—'

'তারপরে চাকরিও পেয়েছি।' একটু টিপ্পনি কাটলুম।

'তা তো জানেই।' গোবিন্দপদবাবু বিচলিত হলেন না: 'তারপরে, আসল খবরটাও ও-ই বললে যে, তুমি এখনো বিয়ে করোনি। আমাকে একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা দিয়েছ কাল।'

'কখন বললে?'

'তখুনি।'

'সেই আলাপ-আলোচনার সময়? এখানে আসবার আগে?'

'হ্যাঁ, কথায়-কথায় বেরিয়ে গেল।'

'কিন্তু কী করে' জানলে সে ও-কথা?'

'কী মুস্কিল,' গোবিন্দপদবাবু আমাকে কোণায় এনে ফেললেন, 'তোমার সঙ্গে ওর আজ দু'বছরের আলাপ, আর এই মূল্যবান কথাটাই ও জানে না? এমন বোকাও কেউ আছে?'

আমি যে একজন আছি মুখমণ্ডলে তাই বোঝাবার চেষ্টা করলুম। পরে মুখে হাসি টেনে বললুম, 'কিন্তু আপনি কেন তার প্রতিবাদ করলেন না?'

'করেছিলুম আমার সাধ্যমতো, কিন্তু মেয়ে বিশ্বাস করতে না চাইলে করবেকি? বলে, তোমার বোন কমলার সঙ্গে ওর ভীষণ ভাব ছিলো, মাত্র তিন মাস হলো সে মারা গেছে। তোমাদের আলাপ-পরিচয়ের কথা ছেড়ে দি, বোনের মারফত দাদার সকল কৃতিত্বের কথাই ওর কানে আসতো, মানে তোমার সাহিত্য, তোমার বিদ্যাবত্তা, তোমার সব-কিছু। আর যদি বিয়ে করতে, সে খবরটা সব চেয়ে সেই দামী খবরটা ওর কানে

পৌঁছুত না ভাবছ ? এই হচ্ছে মেয়ের যুক্তি। তাকে খণ্ডাবো কী করে' ?'
গোবিন্দপদবাবু শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'তখনো তো জানি না দুটি বচ্ছর তোমাদের জানা-শোনা !'

'কেন বললেন না, কমলার মৃত্যুর পরও আমার বিয়ে হতে পারে ?'

'বলেছিলুম বই কি। কিন্তু মেয়ে বিশ্বাস করতে না চাইলে উপায় কী বলো ? বলে, বোনকে তুমি এত ভালোবাসতে-যে, তার মৃত্যুর এত অল্প পরেই নাকি বিয়ে করতে পারো না।'

'স্ত্রী মরলেই করে, তায় বোন !'

'কিন্তু তিন মাসই যদি হয়, তবে এই তিন মাসে তোমার বিয়ের কোনো এভিডেন্স নেই। কেননা গত তিনমাসের মধ্যে তুমি ছুটি নাও নি, এবং এখানেও কোনো বিয়ে হয়নি তোমার। এটুকু আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'এতদুর !' শেষ বাণ প্রয়োগ করলুম : 'আপনার যুক্তিটা দেখালেন না কেন ? দেয়ালের ফটো ?'

দেয়ালের দিকে তাকিয়েই দাদা বলে' উঠলেন : 'ননসেন্স। আমার যেমন বুদ্ধি, তা-ও আমি বলেছিলুম, কিন্তু ব্রততী ঘাড় নেড়ে বললে, হতেই পারে না। ও তুমি ভুল দেখেছ, বাবা। ও কমলার ফটো। বেশ তো, আমি এক্ষুনি গিয়ে যাচাই করে' আসছি, ও ফটো কমলার না আর কারো। বলে'ই তাড়াতাড়ি সে তৈরি হয়ে নিল।'

'তার মানে, ও আপনাকে জোর করে' ঠেলে ফেলে দিয়ে আসেনি ? আপনার পরিষ্কার মত নিয়েই এসেছে ?'

'প্রায় সেই রকম।' কোথায় যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি গোবিন্দপদবাবু যেন বুঝতে পাচ্ছেন না।

'আমি যে সম্পূর্ণ অবিবাহিত সেটা আপনি বিশ্বাস করেছিলেন ?'

'মেয়ের যা চোট, বিশ্বাস করতেই হলো। তারপর পাড়ায় দু'চার-জনের থেকে খোঁজ নিলুম, তারা সবাই তুতুকে সমর্থন করলে।'

হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না তবু হাসলুম। বললুম, 'এবং তা স্পষ্ট জানতে পেরেও আপনি ওকে বাধা দিলেন না কেন? বললেন না কেন, পাড়ার লোকের সাক্ষ্য-প্রমাণই যথেষ্ট, তোকে আর গিয়ে ফটো যাচাই করতে হবে না?'

গোবিন্দপদবাবু উদার গলায় বললেন, 'বাধা দেব কেন, তোমার বোনের বন্ধু, তোমার একজন ভয়ঙ্কর ভক্ত—তায় এখন শুনছি দু'বচ্ছর তোমাদের জানা-শোনা, বাধা দিতে যাবো কেন? আমি কি বর্বর?'

'না, সামান্য একটা বই পড়তে বাধা দেন কিনা, তাই বলছিলুম।' গলার স্বরটা নরম করে আনলুম। বললুম, 'তা হলে ধরে' নিতে পারছি, আমার বইয়ের সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে'ই রাতারাতি আপনি মুক্তদিগন্ত আকাশের মতো উদার হয়ে পড়েছেন!'

গোবিন্দপদবাবু উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলেন, কথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি।

বললুম, 'মুক্তদন্ত নয়, মুক্তদিগন্ত।'

গোবিন্দপদবাবুর আরো হাসি।

'এবং সেই উদারতায় আপনিই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি পাঠিয়ে দেবার কে, সব ওঁর ইচ্ছে।' বলে তিনি উপরের দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন।

'কড়িকাঠের ইচ্ছে? কড়িকাঠ তার কী জানে? মানে, ভূমিকম্পে কড়িকাঠ তখন ভেঙে পড়েনি তাই বলতে চান?'

গোবিন্দপদবাবু হাসতে-হাসতে আমার কাঁধ চাপড়াতে লাগলেন: 'কড়িকাঠের উপরে আর কিছু দেখতে পাও না?'

'শূন্য দেখতে পাই। নিউইয়র্কে ১০২তলা যে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তারও ছাদের উপরে সেই শূন্য।'

'তোমাদের সঙ্গে কথায় কে পারবে বলো?' গোবিন্দপদবাবু নতুন পরিচ্ছদে চলে এলেন: 'এখন বাপু, আমার কথার উত্তর দাও। ব্রততীকে কেমন দেখলে?'

পরিচ্ছেদটা অত্যন্ত সঙ্ক্ষেপ করে' দিলুম। বললুম: 'চমৎকার!'

বিশেষণটাতে গোবিন্দপদবাবু যেন বিশেষ তৃপ্তি পেলেন না, কণ্ঠস্বরে কোথায় বুঝি-বা একটু কৃত্রিমতা ছিল। তাই পুনরায় বললুম, 'আপনার মুখে আমার বইয়ের যেমন সমালোচনা।'

'আরে, সেটা তো প্রায় না পড়ে' সমালোচনা, আর ব্রততীর সঙ্গে তোমার দু'বচ্ছরের পরিচয়।'

'দু'বছরের পরিচয়েও কোনো মেয়েকে ঠিক পড়া যায় না।' টিপ্পনি কাটলুম।

তবু, এক সময়ে যে চমৎকার বলেছি সেটা গোবিন্দপদবাবু ভোলেননি। বললেন, 'মানে, চমৎকার বলতে তুমি ঠিক কী বোঝ?'

'ইংরিজিতে না বললে বুঝি বোঝেন না?' গম্ভীর হয়ে বললুম, 'বেশ ব্রাইট মেয়ে।'

'ঠিক বলেছ, একসিডিঙ্গ্‌লি ব্রাইট। দেখতে একটু কালো বটে, কিন্তু ভারি উজ্জ্বল। কথায়-বার্ত্তায় কী রকম?'

'আপনার মতো dull নয়।'

তাইতেই গোবিন্দপদবাবু খুসী। বললেন, 'আরে আমরা হচ্ছি ওল্ড ফগি, সারাজীবন তো আর আমার সঙ্গে কথা কইবে না। তারপর, লেখা-পড়ায় কী রকম বুঝলে?

'প্রাইভেট টিউটর রাখুন, ঠিকঠাক মত দিতে পারবো।'

'সে তো ভয়ানক সুখের কথা। বি-এ, এম-এ, যতদূর কেননা তুমি পড়াতে চাও।'

'কত মাইনে দেবেন?'

প্রশ্নটা ভেবেছিলুম খুব স্থূল ও পার্থিব শোনাবে, কিন্তু গোবিন্দপদবাবুকে সেটা স্পর্শ করলো না। তিনি স্বাভাবিক মুখে বললেন, 'যা ন্যায্য মনে করো তাই দেব। এই ধরো, দশ হাজার।'

বুকের মধ্যিখানে একটা হাতুড়ির ঘা খেলুম। কতক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলুম না।

গোবিন্দপদবাবু আবার আমার হাত ধরে' টানাটানি সুরু করলেন। 'চলো, এখন একবার আমার বাড়ি চলো, তুতুর মা বিশেষ করে' বলে' দিয়েছে ওখানে তুমি আজ একটু চা খাবে।'

বেঁচে গেলুম কথা বলতে পেরে। বললুম, 'মার্জনা করুন দাদা, জোরালো জোলাপ নিয়েছি। আরেক দিন।'

'বেশ, তবে কাল রাত্রে আমাদের ওখানে খাবে। কেমন?'

'সে তো কাল।'

'হ্যাঁ, ভুলে যেয়োনা। বেশ, কাল আরেকবার মনে করিয়ে দেব'খন।' গোবিন্দপদবাবু উঠলেন: 'সব খাও তো? ফাউল? কিম্বা গ্রীন পিজান্? এমন একসেলেণ্ট রোস্ট করতে পারে তুতু।'

'রক্ষে করুন। মাছ-মাংসই খাইনা।'

দাদা হতভম্ব হয়ে গেলেন, ব্যাপারটা তাঁর কাছে কেমন অনাধুনিক শোনালো।

বললুম, 'পৃথিবীর সব হোমরা-চোমরারাই নিরামিষাশী। গান্ধি, হিটলার, ব্যারন হিরানুমা, বার্নার্ড শ—সবাই।'

'তা বেশ, নিরিমিষ পাকেই ও রান্না করবে।' এত সহজে পরাজিত

হবেন না এমনিভাবে হাসতে-হাসতে গোবিন্দপদবাবু নিচে নেমে গেলেন। মান্য অভ্যাগতকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম।

পরদিন সকালবেলা উপরওয়ালার কাছে গিয়ে ক্যাজুয়্যাল লিভ-এর দরখাস্ত করলুম। বললুম, আক্কেলদাঁত উঠছে, তীব্র যন্ত্রণা, কোলকাতা গিয়ে অপারেশান করাতে হবে। দরখাস্ত মঞ্জুর হলো এবং গোবিন্দপদ-বাবু দ্বারা পুনঃস্মারিত হবার আগেই স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলুম। সোজা কোলকাতা, নিজের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে ঘোরতর একটা অসুখ বাধালুম—দাঁত থেকে মাথায়। সব সময়েই একটা ভয়, এই কেউ ধরতে আসছে, মারতে আসছে, কাটতে আসছে—যাকে বলে মনোম্যানিয়া। ছুটি নিলুম একমাস, এবং ছুটতে-ছুটতে গিয়ে শেষকালে নিজেই একজনকে গিয়ে ধরলুম, আর ভালো হয়ে গেলুম একদিনে। এত সহজে, একদিনে, এক কথায় হয়ে গেল, বাড়ির সবাই বিস্ময় মানলে। তাকালুম কড়িকাঠের দিকে, এবং টিপ্পনি কাটলুম এই বলে' যে মফস্বলে একা থাকাটা নিরাপদ নয়। চাকরি সেখানে একটা ভীষণ সম্পত্তি, তাকে পাহারা দেবার জন্যে ভালসিন্দুরা একটি মেয়ে চাই।

এক মাস ছুটি নেয়ার ফলে আগের জায়গাটা রদ হয়ে গেল। চলে' এলুম সুদূর কক্সবাজারে। এবং যে ভদ্রমহিলাটিকে সঙ্গিনী করে' নিয়ে এসেছি, বিশ্বাস করুন, তাঁর সঙ্গে শ্লীল-অশ্লীল নিয়ে সাহিত্যিক তর্ক করিনা।

অবসৃত

চাপরাশি খবর দিল : ফটোগ্রাফার এসেছে।

এ-পাশে ও-পাশে কাগজ ছড়িয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে' মিস্টার জগজ্জ্যোতি সরকার তন্ময় হয়ে কি লিখছেন। লিখছেন কতকগুলি গোপনীয়, ইংরিজি করে' না বললে বোঝা যাবে না, কনফিডেনশ্যিয়াল রিপোর্ট, তাঁর নিম্নতন কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে। এক কেতা যাবে উপরে, এক কেতা থাকবে এখানে, টিনের বাক্সে, তাঁর পরবর্তীর জন্য। কারু সম্বন্ধেই কিছু খারাপ না লিখতে হয়, অথচ প্রত্যেকটাতেই ভাষার বেশ তারতম্য থাকে, তারই চেষ্টায় তাঁকে একটু অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে। কিন্তু অন্তত আজকের দিনে অসহিষ্ণু তিনি হবেন না। কেননা তিনি জানেন, জেনে এসেছেন, এই একটু ভাষার উনিশ-বিশেই একেকটা জীবনের আকাশ-পাতাল ঘটেছে। না, কাউকেও তিনি আজ ঘা মারবেন না, এমন-কি নিরঞ্জনকেও নয়, সেই উদ্ধত বুদ্ধিদর্পিত ছোকরা, চিরদিন সমানে যে তাঁর মুখের সামনে বসে' সিগারেট টেনেছে, ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া প্যাণ্ট-কোটে কোনোদিন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, আর তাঁরই এক হুকুমের বে-আইনিত্ব যে উপরওয়ালার কাছে একবার জাহির করে' দিয়ে তাঁর নাকালের একশেষ করে' ছেড়েছিলো, তাঁরই উদ্গারিত হুকুমটা নিঃশব্দে তাঁকেই গলাধঃকৃত করতে হয়েছিলো শেষকালে। ইচ্ছে করলেই পারেন তিনি এখন তাকে বসিয়ে দিতে, কিন্তু বেদনার সঙ্গে করুণা মিশিয়ে তিনি ভাবলেন, দরকার কী! হঠকারী, দুর্বিনীত ছোকরা, বিস্তীর্ণ জীবন তার সামনে, আর তিনি চিরদিনের মতো তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে' পড়ছেন, কী হবে আর তাকে কলমের ডগায় খোঁচা মেরে? আগে, অনেক আগে, যখনো তিনি এমন কার্পেটে-মোড়া খাস-কামরা পাননি, তাঁর মনে পড়লো এবং

মনে করে’ তিনি ঈষৎ হাসলেন, সমস্ত বছর কী তোড়েই না তিনি রাজ্যশাসন করেছেন, আর মেয়াদের শেষে তাঁর বদলির সময় তাড়িত প্রজারা যখন তাদের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে এসেছে, সবাইকে তিনি সেই শোকম্লান সুকোমল মুহূর্তে মুক্তার মত ছোট-ছোট সব সার্টিফিকেট দিয়েছেন; কাউকে বলেছেন সাধু, কাউকে বলেছেন পরিশ্রমী, কাউকে বলেছেন অনুগত। খবরের কাগজের obituary-র মত। সবাই ধার্মিক, সবাই দানশীল, সবাই চরিত্রবান। কাল হাত থেকে তাঁর রাজদণ্ড খসে’ যাবে, হাতের কলমটার দিকে তাকিয়ে তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, তবুও আজকে, শেষ দিনে, কারু তিনি ক্ষতি করবেন না। না, কারু ক্ষতি তিনি করেনওনি কোনো দিন। খুনীকে পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছেন, ফাঁসি দেন নি।

চাপরাশির কথায় মিস্টার সরকারের চমক ভাঙলো। বুঝলেন সময় ফুরিয়ে আসছে। কয়েক বছর ধরে তিনি সেটা অনুভব করছেন। তবু সময় একেবারে ফুরোবার আগে কেউ কাঁদে না, এখনও কিছু বাকি আছে। সদলবলে ফটো তুলতে হবে। তারপর পার্টি আছে বিকেলে।

শেষ দস্তখত করে’ কাগজের দিকে খানিকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন: এই তাঁর শেষ দস্তখৎ! কাল থেকে তাঁর আর দস্তখৎ নেই। কাল থেকে তাঁর নাম জগজ্জ্যোতি সরকার, ঠাণ্ডা, মৃত একটা নাম, একান্ত অর্থহীন; জ্বলন্ত জে, সরকারের এইখানেই সমাধি। কাল থেকে তিনি আর মিস্টার নন, কাল থেকে আবার সেই বাবু। বুকের ভিতর কেমন তাঁর ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকলো। কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার আরেকটা জায়গায় তিনি দস্তখৎ করলেন।

‘আর সবাই এসেছে?’

'দেখে আসি।'

'হ্যাঁ, সবাই এলে পরে আমাকে খবর দেবে। আর তোমাদের নতুন যে সব লিভারি এনে দেয়া হয়েছে সেই সব পরে নাও। আমি আসছি।'

মিস্টার সরকার পকেট থেকে কাঁচির প্যাকেটটা বার করে' একটা সিগারেট ধরালেন। কাগজ-পত্রগুলো ফাইলে পরিপাটি করে' গুছোলেন—হ্যাঁ, আর-সবাই এসে জড়ো হবার আগে তিনি সাত-তাড়াতাড়ি গিয়ে বসতে পারেন না ফটোগ্রাফারের লেনসের সমুখে, যার আসন প্রথমে তাকেই যেতে হয় শেষে, এই হচ্ছে সম্ভ্রান্ততার পরিচায়ক। এবং, মনে রাখতে হবে, আজো তিনি সম্ভ্রান্ত। লাল ফিতে দিয়ে পরিপাটি করে' বাঁধলেন তিনি ফাইলটা। তারপর সেটাকে বাক্সে রেখে শেষ চাবি দিলেন। টিপলেন কলিং-বেল। শব্দটা তাঁর বুকে গিয়ে লাগলো। কেননা, মনে হলো, কাল থেকে তাঁর চাকর-বাকরকে গলা খুলে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে।

'বাক্সটা আপিসে দিয়ে এসো।'

মিস্টার সরকার সাজ করতে উঠলেন, পরিপূর্ণ সাজ। মেয়ে সধবা মরলে যেমন করে' তাকে সাজায়, তেমনি।

আয়নায় কেমন যেন তাঁকে একটু বুড়োটে দেখাচ্ছে। হয়তো সেটা এ ক'দিনের দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার ফল। অন্যথা বুড়ো তাঁকে কে বলবে? কাগজে-কলমে দু' বছর তাঁর কম থাকলেও এ ক' দিন খেটেছেন তিনি অসুরের মতো, মেরুদণ্ডটা এক ইঞ্চি বাঁকা করেন নি। খাস-কামরার এক প্রান্তে লম্বায়িত একটা ইজিচেয়ার পড়ে' আছে, কোনো শিথিল মুহূর্তে সেটাতে তিনি গা এলিয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। সেই ভেবে এখন তাঁর অনুতাপ হলো। কাল থেকে বাড়িতে যে তিনি ঢালা ফরাসে অপর্যাপ্ত গড়াগড়ি দিতে পারবেন সেই চিন্তায় তাঁর সুখ নেই। নেপোলিয়নের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়ে' ঘুমুতে না পারলে শান্তি কোথায়?

অনায়াসে আরো পাঁচটি বছর তিনি পুরোদমে খেটে যেতে পারতেন, কিন্তু কে শোনে কা'র কথা! এক্স্টেনশুন-এর জন্তে দরখাস্ত করেছিলেন, গ্রাহ্য হয় নি। অথচ তাঁর ফাইল ঘেঁটে দেখ, জীবনে ক'টা দিন তিনি ছুটি নিয়েছেন! এত উন্মত্ত ছিলেন তিনি এই কাজ নিয়ে। এত ভালোবাসতেন এই কাজ। এজলাসে বসে' এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর ঘুম পায়নি। তাঁর মুখে কখনো কেউ শুনতে পায়নি কাজ শেষ হয়েছে, কাজ কখনো শেষ হয়! কাজ কেউ করতে-করতে শেখে, কেউ-বা শিখে এসে কাজ করে। উকিলের মুহুরিরা আগের দলে, আর তিনি পরের, তবু রাম-শ্যামের বেলায়ও যা, তাঁর বেলায়ও তাই, সেই অনতিক্রম্য পঞ্চান্ন বছর! আঙুল দিয়ে শুভ্রাগ্র গোঁফগুলি তিনি একবার আঁচড়ে নিলেন। এই গোঁফে এমন একটা নজির প্রচ্ছন্ন ছিলো যে তিনি মিস্টার হয়েও সেটাকে উৎপাটিত করেননি। কিন্তু, মিস্টার সরকার আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সবই ললাট।

'মে আই কম্ ইন্, স্যর?' পর্দার ও-পার থেকে কে বললে।

'আরে, সুধাময় যে। এসো, এসো। আজকে কি আর মে আই কম্ ইন্, মে ইট প্লিজ্ ইয়োর-টিয়োর আছে? সব ফুরিয়ে গেছে।' ফুরোবার ভাব দেখিয়ে মিস্টার সরকার তাঁর চেয়ারে বসে' পড়লেন: 'যাত্রাদলের পোষাক ছেড়ে ভীম বসেছে এখন গাঁজা টানতে।'

সুধাময় এখানকার এক আধা-বয়সী উকিল, প্রায়-উদিত। তাকে সরকার একটু খাতির করতেন—নেপথ্যে।

'কই, পোষাকও ছাড়েন নি, হাতেও সিগারেট। ভীমসেনত্ব তো এখনো জাজ্বল্যমান।'

'আরে ভাই, আসল যে গর্জন, তাই আর নেই। চার্জ দিয়ে দিয়েছি। কাউকে আর বসাতেও পারিনা, কাউকে আর খসাতেও পারিনা।'

শুকনো গলায় সরকার হেসে উঠলেন। বললেন, 'কি, ফটোতে যাচ্ছ তো সব ?'

'তা যাচ্ছি,' সুধাময় আমতা-আমতা করে' বললে, 'কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ ছিল।'

'কী কাজ ?'

সুধাময় পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের করলো। বললে, 'আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে। বেশ ভালো করে'।'

'সার্টিফিকেট !' মিস্টার সরকার অবাক হয়ে গেলেন : 'আমার আবার সার্টিফিকেটের দাম কী! কাল থেকে আমি যারপরনাই সাধারণ— জগজ্জ্যোতি সরকার। বাড়ির গায়ে নেম-প্লেটে নাম খোদাই করে' না রাখলে পৃথিবীতে কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আর চিনলেই বা কি, মানবে না কেউ।'

সেটা যে কী ভয়ঙ্কর দুঃখ সুধাময় তা বোঝবার ভান করলো। বললে, 'কাল থেকে। কিন্তু আজো আপনি স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল।'

'চার্জ দিয়ে দিয়েছি যে। এই যে ছটা দেখছ সেটা সূর্য অস্ত যাবার পরে সন্ধ্যাচ্ছটা।'

'পাঁজির পাতায় লেখা থাকবে না সূর্য আজ কখন অস্ত গিয়েছিলো।' সুধাময় হাসলো।

'কিসের সার্টিফিকেট ?'

'আর কিসের! একটা চাকরির।'

'চাকরি! চাকরি করতে যাবে তুমি কোন দুঃখে ?'

'যে দুঃখে এই চাকরিটা আপনি আজ ছেড়ে যাচ্ছেন।' সুধাময় হাসলো : 'চাকরিটা লোভনীয়।'

'দেখি—'

মিস্টার সরকার কাগজপত্রগুলি অভিজ্ঞ-অভ্যস্তের মতো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। উড়িষ্যার কোন স্টেটে দেওয়ানের কাজ। মাইনেটা বেশ মোটা ও তৈলাক্ত। সার্টিফিকেটও জোগাড় হয়েছে মন্দ নয়। মুরুব্বিও নাকি আছে।

'হবে ?' মিস্টার সরকারের প্রশ্নটা সন্দেহসূচক।

'দেখি চেষ্টা করে। কিছু বলা যায় না।'

না, কিছুই বলা যায় না। নির্ভুল যা জিনিস তাও যে উলটে যায় এ তো তাঁর নিজের জীবনে স্বচক্ষে দেখা। মামলায় লোকে যে কেন অদৃষ্ট-বাদী হয়, মন্দিরে পূজো আর দরগায় সিন্নি দেয়, এ বুঝতে তাঁর আগে কষ্ট হতো। পরে বুঝেছেন, কিছুই বলা যায় না। তাঁর অদৃষ্ট মন্দ বলে' আর কারু অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে না এটা নিছক মিথ্যা কথা। আর, তাঁর উপকার কেউ না করলেও অন্যের উপকার করতে তিনি এক চুলও কুণ্ঠিত হবেন না, যদি উপকার তাতে হয়! এখনো হয়তো সময় আছে।

ব্লটিং-প্যাডের তলা থেকে তিনি একখানা চিহ্নাঙ্কিত চিঠির কাগজ বের করলেন। তারপরে যা লিখলেন, তাতে লেখককে যদি কোনো মূল্য দেয়া হয়, তবে উড়িষ্যা ছেড়ে গোটা ভারতবর্ষেরই দেওয়ানিটা সুধাময়কে ছেড়ে দেয়া উচিত।

কে এসে বললে, 'সবাই এসেছেন।'

ত্রস্তভঙ্গিতে সরকার উঠে পড়লেন। বললেন, 'চলো হে চলো, রোদ চলে যাচ্ছে।' পরের মুহূর্তে মুখ তাঁর ভারি কাতর দেখালো : 'আর এই রোদটুকু চলে' গেলেই তো অন্ধকার। বড্ড কেমন সকাল-সকাল মনে হচ্ছে না ?'

'কিন্তু আপনার এই অন্ধকারের অর্থই তো আরেকজনের আলো!' সুধাময় হাসিমুখে অথচ নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'আপনি চলে যাবেন মানেই

তো আরেকজন আসবে। পথ জুড়ে আর কত পড়ে থাকবেন? একটু নতুন রোদ, নতুন রক্ত আসতে দিন। বাইরে কত ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রথমে একটা দলবদ্ধ ফটো তোলা হলো। মৃতা সধবার যেটুকু শোভা বাকি ছিল সেই ফুলের মালা উঠলো গলায়। পরের ফটোটা মিস্টার সরকারের একলার, আবক্ষ।

পার্টির উদ্যোক্তারা তাঁকে ঘিরে ধরলো, ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যেতে হবে। সাড়ে ছটায় বায়স্কোপ কোম্পানির শো, তার আগে হল তাদের খালি চাই।

'দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে এগুলো ছেড়ে ভদ্রলোক হই!' সরকার গোঁফের আড়ালে ম্লান একটু হাসলেন। পরে ঈষৎ বিরক্তির সুরে বললেন : 'এত অল্প সময়ের জন্যে বায়স্কোপ-হল ভাড়া নিতে গেলে কেন? কোথাও একটা শামিয়ানা টাঙিয়ে নিলেই হতো।'

ঘুরে-ঘুরে এর-ওর সঙ্গে তিনি দেখা করতে লাগলেন। মুখ অসম্ভব বিষণ্ণ, চোখ বাষ্পাকুল, ডান হাতের তালুটা ঘর্মাক্ত—সবাইকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন বলে নয়, চাকরিটা ছেড়ে যাচ্ছেন বলে।

বাড়ি যাবেন বলে তিনি তাঁর গাড়িতে এসে উঠলেন। আর ঘোড়ার গাড়ি নয়, দস্তুরমতো স্ট্যাণ্ডার্ড—যদিও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। দূর থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু হর্ন শুনে। তাতে দুঃখ নেই, কেননা তাঁর চেহারা দেখেও তো লোকে বুঝতে পারে যে চাকরিটাও তাঁর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। দুঃখ হচ্ছে এই, গাড়িটা আর রাখা যাবে না।

বাড়ির সামনে আসতেই বুকটা তাঁর ভেঙে গেল, এই বাড়ি তাঁকে কাল ছেড়ে দিতে হবে। কোলকাতার লেক-অঞ্চলে তিনিও বাড়ি করেছেন বটে, সেটা শুধু একটা বাড়ি, ইট কাঠ দিয়ে তৈরি, এরকম

একটা দুর্গ নয়, যা তৈরি ভয় দিয়ে ভক্তি দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে। তার নাম শুধু বাড়ি, কুঠি নয়। আর, অদৃষ্টে সুখ না থাকলে, নিজের বাড়িও ভোগ করা যায় না। বাড়িটা তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন এক মাদ্রাজীকে, অনেক টাকায়। নোটিশ দিলেও সে বাড়ি ছাড়ছে না, বলছে আরো কিছু দিন সময় চাই। মিস্টার সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, শেষকালে কিনা তাঁকেই বাদী হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

প্যাকিং প্রায় শেষ, শুধু নিচে ড্রয়িং-রুম আর উপরে শোবার ঘরটা ছাড়া। খাট খুলে ফেলে রাতের বিছানাটা মেঝেয় পাততে গৃহিণীর কষ্ট হচ্ছে। আর, এখনো, যবনিকা পড়ে গেলেও, গ্রীন-রুমে কেউ-কেউ আসতে পারে ভেবে ড্রয়িং-রুমটা গুটোনো হয়নি। শ্মশানে পুড়িয়ে আসার পর লোক যেমন মুখে বাড়ি ঢোকে মিস্টার সরকারের তেমনি মুখ।

তিনি ড্রয়িং-রুমেই প্রবেশ করলেন। সমস্তই ঠিক আছে, পিতলের ডাবোর থেকে ব্র্যাসোর কৌটোটি পর্যন্ত। কেবল মাঝখান থেকে তিনিই বেঠিক হয়ে গেছেন। দুটো ছেলে, একটাও মানুষ হয়নি, একটা ঢুকেছে ফিল্মে, আরেকটাকে স্বদেশী ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বহু টাকা আমানত দিয়ে, ব্যাঙ্কটি গণেশ উলটেছে, ছোট একমাত্র মেয়েটার যেখানেই সম্বন্ধ করতে যান, বিশ হাজারের কম কেউ হাঁকে না। এর পর তাঁর বৈঠক-খানা ঘরের কি চেহারা হবে কল্পনা করে বুক তাঁর কয়েক ইঞ্চি দমে গেল। গৃহিণীর ইচ্ছে এসব আসবাবপত্র তিনি বিক্রি করে দিয়ে যান—মায় মোটরগাড়ি, যেমন তিনি পুরোনো খবরের কাগজ, কম্পাউণ্ডের ঘাস, বাগানের বাঁধাকপি বিক্রি করেন। নইলে এগুলো নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন, যখন তাঁদেরকে এখন ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে উঠতে হচ্ছে,

আর যখন এদের জন্যে কাণাকড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে না। তবু, কেমন খারাপ দেখায়, এদেরকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে যেতে। কত আনন্দদায়ক স্মৃতি এতে জড়ানো। তা ছাড়া পুরোনো ল্যাবেলগুলো এখনো আঁটা আছে।

গৃহিণী এরি মধ্যেই তাঁর সাবেক মধ্যবিত্ততায় নেমে এসেছেন। দড়িদড়া নিয়ে তিনিই বাঁধছেন একটা ছালা যেটাতে এ মাসের উদ্বৃত্ত ঘুঁটে আর কয়লা রয়েছে সঞ্চিত। কবেকার ক'টা লণ্ঠন, কোন আমলের ক'টা শিশি। নতুন করে, আমূল নতুন করে, আবার যখন সংসার পাততে হবে, তখন কিছুই তিনি ফেলে যাবেন না।

'কি গো, যাবে নাকি পার্টিতে ?'

'আর পার্টি !' গৃহিণী মুখবিবর দিয়ে বিরাট একটা নিশ্বাস ফেললেন।

এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, গৃহিণী এমন কাতর হয়ে পড়েছেন। স্বামীগৌরবে আলোকিত তাঁর সৌভাগ্যশশী চিরদিনের জন্যে অস্ত যাচ্ছে। কোলকাতায় কে আর জানতে আসবে কত তাঁর প্রতাপ ছিল! কে জানতে আসবে কত তিনি আপিল শুনেছেন, কত তিনি ইনস্পেকশন করেছেন, কত তিনি ফার্স্ট-ক্লাশ টি-এ পেয়েছেন! হায়, আজ কিনা তাঁকে ইণ্টার-ক্লাশে ফিরে যেতে হবে। মধ্যবিত্ত কি, মধ্যবিত্তেরো অধম। আর তিনি 'ব্যেরা' বলে ডাকতে পারবেন না, তাঁকেও চাকর-বাকররা মেমসাহেব না বলে মা বলবে। ছেলেমেয়েদের জন্যে কাগজ-পেন্সিল কিনতে হবে। ডাক আসবে ডাক-পিওনের হাতে, কত দেরি করে। মালদা থেকে কেউ আম পাঠাবে না, সাতক্ষীরা থেকে নারকোলি কুল। দেখতে-না-দেখতেই সব শেষ হয়ে গেল। আর সভা! কোলকাতার স্কুল পুরস্কার-বিতরণী সভায় আর তাঁকে কে ডাকবে মিষ্টি হেসে বই ক'খানা এগিয়ে দেবার জন্যে ?

স্ত্রীর মনের ভিতরটা মিস্টার সরকার দর্পণের মতো দেখতে পেলেন। কিছু না বলে চলে গেলেন উপরে, পোষাক বদলাতে। অনেকক্ষণ ভাবলেন, ধুতি-চাদর পরবেন না স্যুট পরবেন, কোনটা বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। আজকের দিনে ধুতিটাই বোধ হয় বেশি সম্ভ্রান্ত, কিন্তু নতুন যে স্যুটটা তিনি সাহেবী দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন সেটা আজো পরা হয়নি। সে-কথা ভেবে তাঁর মনটা শিশুর মতো আকুলিবিকুলি করে উঠলো। ইহজীবনে কবেই বা সেটা পরবেন, যদি আজ না পরেন! চিতায় উঠে আরেকবার কি বেশ-বদল হয় না? ভাবলেন মিস্টার সরকার।

সেই মামুলি পার্টি। রঙিন কাগজের শিকল, ফুলের মালা আর ফিরপোর কেক। শেষোক্তটা অবিশ্যি বড় টেবিলে যেটাকে ঘিরে সহরের গণনীয়েরা বসে', আর সব খুচরো টেবিলে সিঙাড়া আর পান্তুয়া। সেই ওপেনিং সঙ্, বক্স-হার্মোনিয়ম বাজিয়ে, গানের বিষয়টা যেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। তারপরে সেই নিষ্প্রাণ বক্তৃতা, কারুটা বা মুখস্ত করা, আর তার উত্তরে মিস্টার সরকারের কান্না-উপচানো করুণ কাতরতা—সবাইকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন, সব-কিছুকে তিনি ছেড়ে যাচ্ছেন। তারপরে, মৃতের উপরে খড়্গের আঘাতের মতো, আরেকটা গান, সভার পরিভাষায় যাকে বলে কনক্লুডিং সঙ্।

সমস্ত রাত মিস্টার সরকার আর তাঁর জীবনসঙ্গিনী কেউই ভালো ঘুমুতে পারলেন না। ঘুম থেকে উঠলেন, তখন রোদ উঠে গেছে। জীবনে এই প্রথম ব্যতিক্রম, ঘুম থেকে উঠেই রোদের মুখ দেখা, বিস্বাদ নিরানন্দ রোদ। আজ আর জগজ্জ্যোতি আটটার সময় স্নান করলেন না, পোষাক পরলেন না, হাত মুখ ধুয়েই যেমনটি ছিলেন তেমনি ভাবে পায়ের চটি ফটফটিয়ে নিচে নেমে গেলেন। এই তাঁর ধুতিতে প্রথম অবতরণ হলো।

দেখলেন নিচেটা শূন্য, কেউ কোথাও নেই, কেউ আসবেও না আর। সেই দিন থাকলে সামান্য সর্দি হয়েছে শুনেই কাতারে-কাতারে লোক আসতো তাঁকে দেখতে। আর, আজ তাঁর এই দুঃসময়ে কারুরই টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখা গেল না। উপায় নেই, রিপোর্ট তিনি দিয়ে দিয়েছেন, তার আর রদ-বদল সম্ভব নয়। সংসার এমনই অকৃতজ্ঞ।

সিগারেট ধরিয়ে বাসি খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে জগজ্জ্যোতি বসলেন তাঁর ড্রয়িং-রুমে। হঠাৎ জুতোর আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখলেন সত্যপ্রকাশ। আজকের দিনে বিশিষ্ট বন্ধুকে সম্বর্ধনা করবার যে কী ভাষা, জগজ্জ্যোতি হঠাৎ খুঁজে পেলেন না।

সত্যপ্রকাশ এখানকার একজন বয়স্ক উকিল, খ্যাতিসম্পন্ন। কালেজী জীবনে একসঙ্গে ছিলেন এক হোস্টেলে, এক ঘরে, প্রথম যৌবনের নির্বোধ প্রগল্‌ভতায় দু'জনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লো, একজন তক্তপোষের উপরে আরেকজন মেঝেয়। তবু কোনোদিন, মানে এ ক'দিনের মধ্যে কোনোদিন, বন্ধুতার সুতো ধরে' সত্যপ্রকাশ কাছে আসতে চাননি, বরং যতদূর সম্ভব সুতো ছেড়ে দিয়ে ব্যবধানটাকে তিনি বিস্তীর্ণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ঘুড়ি যখন আজ কাটা পড়েছে, তখন কী আসে-যায় সুতোয় মাঞ্জা ছিল কি না-ছিল!

'কি হে, কোনো অসুখ করেছে নাকি?' ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্যপ্রকাশ জিগগেস করলেন।

'কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি। বোধ হয় ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

সত্যপ্রকাশ একদৃষ্টে দেখছিলেন জগজ্জ্যোতিকে। খর্বাকার,

স্থূলোদর, পেশীবলিষ্ঠ সেই জগজ্জ্যোতি একদিনেই কেমন বুড়ো, জীর্ণ-বিজীর্ণ হয়ে গেছে। যেন উঠে এসেছে কোনো শোকের সমুদ্র থেকে, এক জনহীন তৃণগুল্মহীন মরুভূমিতে। এমনি একটা ত্রস্ত, আর্ত চাহনি।

সত্যপ্রকাশ মুখোমুখি একটা কৌচে বসলেন। বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম, গভীর আনন্দে কাল তুমি ঘুমুবে, ফুলশয্যার রাতের পরে এই আরেকটা তোমার রাত। সেই রাতটা ছিল জাগবার আর এটা ঘুমুবার।' নিজের রসিকতায় নিজেই সত্যপ্রকাশ হাসলেন।

'ঘুমুব ?' জগজ্জ্যোতি কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন পিছন থেকে পিঠে তাঁর কে ছোরা মেরেছে।

'ঘুমুবে না ? নাকে তেল দিয়ে ঘুমুবে। এতদিন প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করেছ, এখন সসম্মান বিশ্রাম মিলেছে—এই তো ঘুমুবার সময়, এই তো জীবনের মুক্তি, জীবনের আরম্ভ। আমি হলে তো হাত-পা তুলে নাচতুম, মুখ ভার করে জরদ্গবের মতো বসে থাকতুম না।' সত্যপ্রকাশ উচ্চশব্দে হেসে উঠলেন।

জগজ্জ্যোতি নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলেন। পরে, বহু দিনের রুগীর মতো দুর্বল গলায় বললেন, 'তুমি বলছ কী পাগলের মতো ? আমার মনে হচ্ছে আমি এখন জলের বাইরে মাছ, যেন নিশ্বাস নিতে পাচ্ছি না। সমস্ত নোঙর আমার ছিঁড়ে গেছে। বলতে পারো, আমার সময় কি করে কাটবে—আমার দিন, আমার রাত, সকাল আর সন্ধে ? পারো বলতে ?'

'খুব পারি। স্রেফ ঘুমিয়ে।' সত্যপ্রকাশ আবার হাসির রোল তুললেন। পরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঘুমুতে না পারো, বেরিয়ে পড়ো দেশ ছেড়ে। ফিলিপাইনসে চলে যাও, চলে যাও নিউ জেল্যাণ্ডে।

তুমি এখন স্বাধীন, তোমাকে আর পায় কে! আমি হলে তো ঠিক তাই চলে যেতুম।'

'তুমি কী যে বলো!' জগজ্জ্যোতি মনে-মনে মানচিত্রটা কল্পনা করলেন, কিন্তু কিছুরই সন্ধান পেলেন না।

'অতদূর না পারো, ভারতবর্ষটাই চষে দেখ। বাঙলার মফস্বলের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ একবার এই চমৎকার দেশটাকে। কাজ, কাজের কি আর অন্ত আছে? আর কিছু না পাও, একটা কিছু নেশা ধরো—না, স্থূল অর্থে কিছু বলছি না, কেননা তোমার সেই স্নায়ুই আর নেই—নেশা ধরো মানে, take to a hobby, একটা কিছুতে সখ করে ফেল—বই কি বাগান কি শিকার কি ফটোগ্রাফি। নেহাৎ আর কিছু না পারো, পুরীর সমুদ্রে গিয়ে ঝিনুক কুড়োও। ঠিক বাঁচবে দেখো, ঠিক ঘুমুতে পারবে।'

'আমি আর কোনো কাজেরই উপযুক্ত নই।' জগজ্জ্যোতি শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, 'জীবনের একটা জানলাও আর আমার খোলা ছিল না। আমি অন্ধকূপে বসে ছিলুম। আজ সব দরজা-দেয়াল ভেঙে যাওয়াতে এত আলো-হাওয়া সইতে পারছি না, আমার দম আটকে-আটকে আসছে।'

'তবে আর কি, বাড়ি ফিরে গিয়ে ইস্কুলের একটা মাস্টারি নাও।'

এটার অসম্ভবনীয়তায় দুজনেই হাসলেন।

অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মর্দিত করে জগজ্জ্যোতি বললেন, 'আমি জানি আমার কী করে সময় কাটবে।'

'কী করে?'

'বাজার করে, পার্কে বেড়িয়ে আর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দোকানের রেডিয়ো শুনে।'

সত্যপ্রকাশ হাসতে চাইলেন অথচ হাসতে পারলেন না।

'আর দিনের পর দিন, প্রতিদিন দিন গুনে। আর, তারি মাঝে, মাঝে-মাঝে চিনির ওজন আর রক্তের চাপ দেখে। আর ঐ যা বললে, ঘুমিয়ে। কিন্তু জানো, এ পর্যন্ত দুপুরে একফোঁটা ঘুমুইনি কোনোদিন। ভেরোন্যাল খেতে হবে হয়তো।'

'কেন, বই, বই নেই ?' সত্যপ্রকাশ উল্লসিত হয়ে বললেন।

'বই ?' জগজ্জ্যোতি তাকালেন একবার তাঁর বুক-কেসের দিকে। সেখানে কয়েকখানা কি বই সাজানো আছে, যা তিনি কোনোদিন পড়ে দেখেন নি, যা তিনি আসবাব-রূপেই ব্যবহার করে এসেছেন। বই! কত বই এসেছে তাঁর বাড়িতে, চাপরাশির কাঁধে চড়ে, সমস্ত টেবিল আর মেঝে প্লাবিত হয়ে গেছে। আরো বই, এখনো বই—জগজ্জ্যোতির মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা সূঁচ চলে গেল। পরে, কী মনে করে বললেন, 'হ্যাঁ, উপনিষৎ কয়েকখানা কিনে নিতে হবে।'

'উপনিষৎ ?'

'তবে কি তুমি ল-ডাইজেস্ট কিনতে বলো ? উপনিষৎ ছাড়া আর পড়বার কী আছে এই বয়সে ?'

দেয়ালের ঘড়িটা এখনো প্যাক করা হয়নি, আওয়াজ করে দশটা বাজলো। নিজেরো অজানতে চটি-জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে জগজ্জ্যোতি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন : 'কী সর্বনাশ, একেবারে খেয়াল নেই, দশটা বেজে গেছে।'

সত্যপ্রকাশের সম্পূর্ণ খেয়াল ছিল, তাই তিনি কোনো চাঞ্চল্য দেখালেন না। বললেন, 'অত তাড়া কিসের ? আজ থেকে তো তোমার আর চাকরি নেই!'

'ও, হ্যাঁ।' জগজ্জ্যোতি বসে পড়লেন। নিজেকে সামলে নিয়ে

বললেন, 'তবু এতদিনের অভ্যেসটা ভাঙতে কেমন অসুবিধে লাগে। আচ্ছা, তুমি এখন চা খাবে ?'

সত্যপ্রকাশ স্বল্প হাসলেন। বললেন, 'তোমার মতো ছাড়া পেলে চা কেন আরো-কিছু হয়তো খেতুম; কিন্তু মুখের রক্ত না ওঠা পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই। সুতরাং দশটা বেজেছে বলে তোমাকে উঠতে হবে না, উঠতে হবে আমাকে। আজ বিকেলেই যাবে নাকি ?'

জগজ্জ্যোতিও উঠলেন : 'হ্যাঁ, বাঁধাছাঁদা এখনো কিছু বাকি আছে।'

বিকেলে স্টেশনে এসে দেখলেন, কেউ নেই। না, লোক আছে বিস্তর, কিন্তু তারা তাঁর কেউই নয়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের উপর দিয়ে অনেক পাতার গেট, ফুলের মালা, কাগজের নিশান, ছাপানো চিঠি, পটকার শব্দ, চায়ের পেয়ালা, কেকের প্লেট, কই মাছের হাঁড়ি, ঘিয়ের টিন একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে ছত্রখান হয়ে চলে গেল। ইণ্টারক্লাশের ছোট একটা কামরায় তিনি মুখ লুকিয়ে বসলেন। কেউ যে আসেনি, ভালোই করেছে।

এইখানেই পড়তে পারতো যবনিকা, কিন্তু আরো একটা ট্রেন আছে, সেটা চলেছে দক্ষিণে, মাস কয়েক পরে।

ইণ্টার-ক্লাশের কামরাটা জনাকীর্ণ। এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি, কিন্তু গাড়ি অনেক দূর চলে আসার পর জগজ্জ্যোতির মনে হলো, কোণের ঐ লোকটিকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন। চট করে মনে করে ফেলবার কথা নয়, কেননা কত জায়গায় কত লোকের সংস্রবে তাঁকে আসতে হয়েছে, কত বৎসর ধরে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই অর্ধ-বিস্মৃত লোকটিও তাঁর দিকে চেয়ে আছে, অপলক দৃষ্টিতে।

সুধাময়, অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে জগজ্জ্যোতির খেয়াল হলো। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, সুধাময় না ?'

সুধাময় এক লাফে মাঝের বেঞ্চি পেরিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। বললে, 'আপনাকে প্রথমটা একেবারেই চিনতে পারিনি। এ কী হয়ে গেছেন আপনি !'

চেনা কঠিন, জগজ্জ্যোতি তা নিজেই জানেন। কিন্তু সুধাময় সে-অর্থে বলেনি। চেহারা তাঁর আধখানা হয়ে গেছে, সেই অভিজাত পৃথুলতার চিহ্নও কোথাও নেই, দুই চোখে কেমন একটা শুষ্ক জ্বলন্ত দৃষ্টি।

'আপনার শরীর কি খুব খারাপ ?'

'হ্যাঁ, ইনসোমনিয়া, ঘুমুতে পারি না। বসে থেকে-থেকে আর ঘুম হয় না।'

'তবে চলেছেন কোথায় ? চেঞ্জে ?'

'হ্যাঁ।' জগজ্জ্যোতি হাসলেন : 'আর তুমি ?'

'সেই একটা চাকরির কথা আপনাকে একদিন বলেছিলুম না, যার জন্যে আমাকে আপনি একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' জগজ্জ্যোতি শিউরে উঠলেন : 'কি হলো সেটার ? পেলে ?'

'না, পাইনি এখনো।' সুধাময় হাসলো : 'তবে একটু আশা হয়েছে।'

জগজ্জ্যোতি তার দিকে অর্থহীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'সেখান থেকে ইনটারভিয়ুর চিঠি দিয়েছে। কাল ইনটারভিয়ু। তাই চলেছি। অনেক য়্যাপ্লিক্যাণ্ট, তবে খোঁজ নিয়ে জানলুম, বাঙলা দেশ থেকে আমিই একমাত্র নির্বাচিত হয়েছি।' কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে সুধাময় বললে, 'যদি হয়, আপনার জন্যেই হবে। আপনার সার্টিফিকেটটাই কাজ করেছে। আপনার ঋণ এ-জীবনে শুধতে পারবো না।'

নীরক্ত মুখে মৃত গলায় জগজ্জ্যোতি বললেন, 'যদি পাও, একদিন খাইয়ে দিয়ো।'

ট্রেন চলছে, জগজ্জ্যোতির মুখে আর কথা নেই। সুধাময় বুঝলো তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, শরীরটা একটু বিস্তৃত করতে পেলে যেন বিশ্রাম পান। তাই যাত্রীদের বসার অনেক অদল-বদল করে জগজ্জ্যোতির জন্যে সে শোবার জায়গা করে দিল, নিজে বসলো গিয়ে একটা কার ট্রাঙ্কের উপর। বললে, 'আপনি একটু শোন। দেখুন ট্রেনের আওয়াজে যদি ঘুম আসে।'

জগজ্জ্যোতি জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'না, এই বেশ আছি।'

কতক্ষণ পরে কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো। দু' দরজাতেই ভিড়, যত লোক নামে তার চেয়ে বেশি এসে জড়ো হয়। একটা কুলি ধরে জগজ্জ্যোতি জানলা দিয়ে তার মাথায় সুটকেস আর বিছানাটা চালান করে দিলেন, আর ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। সুধাময়কে কিছুই বললেন না।

কি-ই বা বলবেন!

একমাত্র বলতে পারতেন যে, বাঙলা দেশ থেকে পদপ্রার্থী সে একা নয়, আর একাই সে ইনটারভিয়ুর নিমন্ত্রণ পায়নি। বলতে পারতেন, কিন্তু পারলেন না বলতে। কি জানি কেন, নতুন জায়গায় অপরিচিত স্টেশনে ইলেকট্রিকের আলোতে অসংখ্য জনসমাবেশের মধ্যে সুধাময়ের একটা কথা মুহুর্মুহু তাঁর মনে পড়তে লাগলো: 'পথ জুড়ে আর কত পড়ে থাকবেন? একটু নতুন রোদ, নতুন রক্ত আসতে দিন।'

কুলিকে একটা আলোর নিচে দাঁড় করালেন। নামিয়ে নিলেন মাল দুটো। তারপর তাকে বিদায় করে দিয়ে তাকালেন চারদিকে।

কোটের ভিতরকার পকেট থেকে বার করলেন ভাঁজ-করা সেই ইনটারভিয়ুর চিঠিটা। তীক্ষ্ণ চক্ষুতে একবার পরীক্ষা করে দেখলেন, আর কোনো দরকারী জিনিস কিনা। না, সেই চিঠিটাই। বারে-বারে পড়লেন, এ-পিঠ ও-পিঠ দেখলেন, যেমন বহু দলিল তিনি দেখেছেন, না সেই চিঠিটাই, তার নাম, পোস্টাপিসের ডেট-স্ট্যাম্প, প্রেরকের ঠিকানা—কোনোই ভুল নেই। এভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে দৃঢ়সিদ্ধান্ত হয়ে চিঠিটা খণ্ড-খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেললেন। সামনে তাকালেন অন্ধকারে, ট্রেনের পিছনের আলোটা কোথাও দেখা গেল না।

খিল

অভাবনীয়েরো একটা সীমা থাকা উচিত।

আপিসেই সুরজিৎ তার পেলো, রাতে, বরিশাল এক্সপ্রেসে অশোকা আসছে। আশ্চর্য, অশোকা কি জানে না কিছুই? ঘটনাটা তো ঘটে গেছে আজ এক বছরেরো উপর।

তবু, রাতে, বেশ একটু আগেই সুরজিৎ স্টেশনে গেল। গাড়ি ঠিক রাখলো। এবং যতক্ষণ না বাঁকের মুখে ইঞ্জিনের হেড-লাইট দেখা যায় ততক্ষণ প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চিন্তিত ভঙ্গিতে পাইচারি করলো।

ইণ্টার-ক্লাশের মেয়ে-কামরা থেকে নামলো অশোকা। বয়েস—বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছে, এবং নিঃসম্বল ও নিরভিভাবক যখন সে আসছে, বুঝতে হবে সে কুমারী ও স্কুল-মিসট্রেস। আঠারো ইঞ্চির একটা পাৎলা সুটকেস ছাড়া সঙ্গে আর কোনো জিনিস নেই। শীতের রাতে বিছানাও নিয়ে আসেনি। মোটা সিল্কের একটা ব্লাউজ মোটে গায়ে—শীতের রাতে যার সংক্ষিপ্ততার চেয়ে হঠকারিতাটাই বেশি করে চোখে পড়ে।

দু'জন পরস্পরের দিকে চেয়ে সংক্ষেপে হাসলো। প্রায় দশ-এগারো বছর পরে দেখা। কিন্তু চিনতে কারুরই দেরি হলো না। যেন কিছু দিন আগেই আর কোথাও তাদের এমনি অপ্রত্যাশিত দেখা হয়েছে।

'একেবারে তুমি যে আসবে তা ভাবিনি।' অশোকা সলজ্জমুখে সামান্য হাসলো: 'ভেবেছিলাম আর্দালি-চাপরাশি কাউকে পাঠিয়ে দেবে হয়তো।'

'আর্দালি-চাপরাশি কেউ রাতে থাকে না।' সুরজিৎ অশোকার হাতের ব্যাগটার দিকে তাকালো। বললে, 'সঙ্গে আর কোনো জিনিস্ নেই?'

'না।' কুণ্ঠিত ভাবে হেসে অশোকা বললে, 'এক দিনের তো মোটে মামলা।'

সুরজিৎ ব্যাগটা অশোকার হাত থেকে তুলে নিলো। অশোকা আপত্তি করলো না। কিন্তু সেটা তক্ষুনি সে কুলির মাথায় চালান দেবে জানলে নিশ্চয়ই আপত্তি করতো, জোর করলেও ছেড়ে দিতো না।

গাড়িতে উঠলো দুজনে। অশোকা আগে—পিছনের সিটে ; সুরজিৎ মুখোমুখি। বাক্সটা গাড়োয়ানের জিম্মায়।

সংসারে জিনিস যার এত অল্প সে যে কতদূর দুঃসাহসী এই কথাটাই সুরজিৎ ভাবলো। প্রয়োজন তার বেশি না প্রয়োজন তার কম, এই কথাটাই সে বুঝে উঠতে পারলো না।

বললে, 'আমার ওখানে যে চলেছ খুব অসুবিধে হবে।'

'কার ? আমার না তোমার ?'

'তোমার। জানো তো', সুরজিৎ একটু থেমে বললে, 'আমার স্ত্রী, জয়ন্তী বছর দেড়েক হলো মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, কাগজে দেখেছিলুম খবরটা। গণ্যমান্যকে বিয়ে করলে স্ত্রীও গণ্যমান্য হয়।' অশোকা একটু হাসলো কিনা বোঝা গেল না।

সুরজিৎ বললে, 'বাড়িতে একেবারে একা আছি। মেয়েছেলে কেউ নেই—'

'কেন, আমিই তো আছি।' অশোকা স্বচ্ছন্দভাবে বললে।

'কিন্তু কে তোমার দেখাশুনা করে !'

'আমি নিজেই করতে পারবো। এতদিন ধরে তাই করে এসেছি।'

একটুখানি কাটলো।

সুরজিৎ প্রশ্ন করলো : 'এখানে কেন এসেছ জানতে পারি ?'

'আশ্চর্য, তুমিও একটা কৈফিয়ৎ না পেলে সন্তুষ্ট হবে না ?' গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে অশোকার চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল দেখালো। 'সমস্ত রাস্তা গাড়িতে এক ভদ্রমহিলার কাছে লম্বা জবাবদিহি দিতে হয়েছে :

কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার বাড়িতে যাচ্ছি, সে আমার কে হয়, সেখানে আর কে-কে আছে, ইস্টিশানে কে আসবে নিতে—এক গাদা প্রশ্ন। উঃ, প্রাণ প্রায় যায়।'

'সবগুলি উত্তরই বেশ সন্তোষজনক হয়েছিলো আশা করি।'

'অন্তত ভদ্রমহিলা তাই মনে করেছিলেন।' অশোকা শব্দ করে হেসে উঠলো।

'ও-সব প্রশ্নের বেশির ভাগ উত্তরই আমার জানা, শুধু একটা ছাড়া। কেন এসেছ সেইটেই শুধু জানতে চাই।'

'এমনিতে আসতে পারি না?'

'কেউ পেরেছে বলে তো শুনিনি এ পর্যন্ত।'

'কেউ মানে?'

'কেউ মানে বয়স্ক কুমারী মেয়ে। একাকী কোনো পুরুষের আশ্রয়ে। বলো না, কেন, কী দরকারে এখানে এসেছ?'

'বাবাঃ, কী কৌতূহল তোমার!' অশোকা আঁচলটা একটু টানলো, চুলটা একটু অনুভব করলো, গলার হারটা একটু আঙুল দিয়ে নাড়লো। বললে, 'তোমাদের এখানকার মেয়ে-ইস্কুলে হেডমিসট্রেসের চাকরিটা পাবো বলে মনে করছি। কাল সকালে তারই ইণ্টারভিয়ু।'

'সে ক্ষেত্রে,' সুরজিৎ একটু কাশলো: 'মেয়ে-ইস্কুলের হস্টেলে ওঠাটাই কি ঠিক ছিল না? কাল সকালে ইস্কুলের সেক্রেটারি যদি জিগগেস করেন, কোথায় ছিলে, তা হলে তোমার মুখের জবাব শুনে খুব বেশি তিনি খুসি হবেন বলে মনে হয় না।'

'প্রথমতো, তাঁর সে-কথা জিগগেস করাই উচিত হবে না, দ্বিতীয়তো,' অশোকা সহাস্য স্বাচ্ছন্দ্যে বললে, 'তোমার মতো এত ভীতু তিনি না-ও হতে পারেন।'

এর উত্তরে সুরজিতের কথাটা কেমন গম্ভীর, একটু বা বোকাটে শোনালো। সে বললে, 'এক-আধটু ভীতু হওয়াটা মন্দ নয়। বিশেষ করে তার, যে চাকরি করতে বেরিয়েছে।'

'তোমার মতো চাকরির জন্যে আমার অত মায়া নেই। নাই বা হলো চাকরি।' বলে অশোকা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে গলাটা সামান্য উঁচু করে ধরলো।

কেমন যেন তাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ও অসহায় দেখালো হঠাৎ। মনে হলো যেন তার হাত-পা গাল-গলা শীতে নিদারুণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্রথমে একটা সাদা গেঞ্জি, তার উপরে উলের গেঞ্জি, তার উপরে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, তার উপরে শাল—তবু সুরজিতের শীত মানছে না, ইচ্ছে করছে প্রকাণ্ড একটা লেপ জড়িয়ে বসে থাকে, অথচ এই গলিত শীতে ঐ তার চেহারা। এটা হতাশা না ঔদ্ধত্য তা কে বলবে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে-থাকতে সুরজিতের চক্ষু কেমন কোমল হয়ে এলো। বললে, 'তোমার শীত করছে না ?'

'না।'

সুরজিৎ অল্প একটু হাসলো। বললে, 'শীতের কাছে ভীতু হওয়াটা অশাস্ত্রীয় হবে না। আমার গায়ের কাপড়টা নাও।' বলে শালটা গা থেকে খুলে নিয়ে অশোকার কোলের উপর সে রাখলো।

অশোকা চমকে উঠলো। বললে, 'দেখো, তোমার না ঠাণ্ডা লাগে। আগে-আগে একটুতেই তোমার ঠাণ্ডা লাগতো—ব্রঙ্কাইটিসের দোষ ছিল। সে সব এখন সেরে গেছে, না ?'

'কিছুই সম্পূর্ণ সারে না।'

'তবে তুমিই গায়ে রাখো। একা-একা আছ, অসুখ-বিসুখ হলে মুস্কিল হবে।'

'তার চেয়ে আরো মুস্কিল হবে যদি তোমার অসুখ করে।'

অশোকা আবার হেলান দিল। ক্লান্তরেখায় গলাটা আবার একটু উঁচু করলে।

'কী, খুলে গায় দাও না।'

'না, এই বেশ আছি।' শালটা তেমনি রইলো অশোকার কোলের উপর পড়ে। গাড়ি থেকে নামবার সময় কি মনে করে শালটা সে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো।

প্রকাণ্ড বাড়ি। একজনের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ। নিচে দু'খানা ঘর, একটাতে বৈঠকখানা, পাশেরটা ভাঁড়ার। চেয়ার-সোফা ও য়্যাশ-ট্রের আধিক্য দেখে বোঝা যায় বৈঠকখানায় প্রচণ্ড আড্ডা বসে। আর, পাশের ঘরে থাকে-থাকে থরে-থরে জিনিস দেখে মনে হয় কী নিপুণ নিখুঁত গৃহস্থালি! অথচ সব চাকর-ঠাকুরের হাতে। একটা ঠাকুর—দুটো চাকর, কোথা থেকে কুটোটি কুড়িয়ে নেবে তারি জন্যে সর্বদা তটস্থ। ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো অত বড়ো না হলেও প্রকাণ্ড উঠোন, তার এক পাশে আনাজের ক্ষেত, অন্য পাশে দিশি ক'টা ফুল-গাছ, কিন্তু কোথাও একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই। বাবু যদি বলে তবে ওরা অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে এমন একটা ভাব যেন ওদের মুখের উপর লেখা আছে। কোনো জিনিসই যেন হাত বাড়িয়ে চাইতে হয় না, সব আগে থেকেই তৈরি। এতটা ভালো নয়, যেন কেমন চোখকে পীড়িত করে—অশোকার মনে হলো। কেননা যে একা আছে তার ঘর-দোর খানিকটা অগোছালো এটাই সকলে প্রত্যাশা করে। এইটাই সকলের প্রত্যাশা করা উচিত।

নিচে স্নানের ঘরে একটু উঁকি মেরে অশোকা সুরজিতের সঙ্গে উপরে উঠে এলো। উঠেই উত্তরের বারান্দা। পাশাপাশি দু'খানি সমান মাপের ঘর, উত্তরে দক্ষিণে দরজা। দু' ঘরের মাঝখানেও একটা দরজা আছে

অবারিত খোলা, যেটায় কোনোদিন এ পর্যন্ত খিল পড়েনি। প্রথমেই ডাইনে যে ঘর সে ঘরটা কিসের যে নয় অশোকা ভেবে পেলো না। বিশালকায় এক টেবিল, দেখলেই সন্দেহ হয় এ-টেবিলের চার পাশে বসেই রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স হয়েছিলো কিনা। আফিসের বাক্স, বেতের বাস্কেট, ফ্ল্যাট-ফাইলে ফিতে-বাঁধা কাগজ-পত্রের স্তূপ, আইনি-বেআইনি মোটা-মোটা বই—কী যে তাতে নেই তা কে বলবে? কিন্তু সমস্তই অদ্ভুত রকমের গুছোনো। খোলা দুটো সেল্‌ফে ঘেঁসাঘেঁসি করে বই সাজানো রয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য, দু'খানা বইয়ের মাঝখানে কোথাও একটু ফাঁক নেই, কোথাও একখানা বই বেঁকে বা হেলে বসেনি। ওদিকের দেয়াল ঘেঁসে লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চি, তাতে ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস সাজানো, একটার উপর একটা। ঘরে স্ত্রী না থাকলেও যে কেউ বাক্স-প্যাটরাগুলি রঙচঙে কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখে অশোকা তা কল্পনা করতে পারতো না। পাশেই দেরাজ—টানাগুলোতে হয়তো আপিসের পোষাক থাকে। তারই সন্নিকটে দেয়ালে ঝোলানো লম্বা একটা আয়না। আয়নাতে শরীরের অনেকখানি দেখা যায় বলে অশোকার কেমন লজ্জা করে উঠলো। দেরাজের উপরকার একটা ছবি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা সে টেনে নিলো। না, মৃত-জীবিত কোনো মানুষেরই সেটা ছবি নয়, সেটা একটা সদ্য-উদ্ভিদ্যমান গোলাপের কুঁড়ি।

আয়নার দু' পাশে দুটো ছোট টেবিল, যদিও ডাইনেরটা অপেক্ষাকৃত বড়ো। বাঁয়েরটাতে প্রসাধনের জিনিস, ডাইনেরটাতে ওষুধ। দুটোই যেন ভীষণ বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। খানিকটা অন্যায় কৌতূহলের মতো দেখায় বলে অশোকা বেশিক্ষণ সেখানে চোখ রাখলো না। পাশেই আলনা আর দুটো ব্র্যাকেট, একটা কাপড়ও কোথাও একটু কুঁচকে বসেনি। আলনার শেষ তাকে সারবাঁধা জুতোর লাইন,

ইলেকট্রিকের আলোয় চকচক করছে। এরি মধ্যে, এ-সবের মধ্যে, ঘরের মাঝখানে বেমানান একটা স্প্রিং-এর খাট।

অশোকা জিগগেস করলো : 'এইখানেই শোও নাকি ?'

'না।. শোবার ঘর ঐ পাশে।'

পশ্চিমের ঘর থেকে পূবের ঘরে অশোকা এল, মাঝখানের দরজা দিয়ে। পশ্চিমের ঘরটা জিনিসপত্রে যেমনি জবরজঙ, পূবের ঘরটা তেমনিই ফাঁকা, নিরিবিলি। মাঝখানে প্রকাণ্ড খাট পাতা, বিঘৎ দুয়েক পুরু গদির উপর নরম তোষকে নিভাঁজ বিছানা করা রয়েছে। পায়ের দিকে লেপ রয়েছে ভাঁজ করা। একজনের পক্ষে যেন অনেক অপচয়, অনেক উদ্বৃত্তি, তাকিয়ে থেকে অশোকার মনে হলো। কিন্তু যতই সে শ্রান্ত হোক না কেন, এখুনি, রাত সাড়ে নটার সময় লেপ গায়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়তে পারে না, এ কথাটা মনে হতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

পাশে একটা ইজি-চেয়ার, আলোর দিকে পিঠ করে। তার হাতের কাছেই ছোট টিপাইয়ের উপর টাইম-পিস ঘড়ি, ক'খানা ছ পেনি দামের হালকা বই আর কখানা রঙিন মলাটের চুটকি সাপ্তাহিক। একবার হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো সে সেগুলি, যেমনি ছিল তেমনি আবার গুছিয়ে রাখলো সন্তর্পণে।

এ ঘরে ঢুকেই অশোকা ভেবেছিলো দেয়ালজোড়া এনলার্জড একটা ফটোর সঙ্গে তার দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হবে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘরের চারদিকে কোথাও জয়ন্তীর একটুকরো একটা ছবি নেই। অশোকার বুকের মধ্যে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শব্দ শুনে নিজেই সে উঠলো চমকে, কেননা সে-নিশ্বাসটা যেন ঠিক দুঃখের মতন বলে মনে হলো না।

অন্য দিকে চোখ রেখে সুরজিৎ বললে, 'হাত মুখ ধোবে না ?'

'পুরোপুরি গা-ই ধোবো। নইলে বড্ড ঘিন-ঘিন করবে। গরম জল পাবো তো ?'

'হ্যাঁ, করেছে গরম জল।'

'দেখ, সাবান-তোয়ালে কিছু সঙ্গে আনিনি।' অশোকা হাসলো।

'তা-ও পাবে।'

'সবই পাবো।' অশোকা বললে, নির্ব্যক্তিকের মতো। পরে অনেকখানি হেসে : 'কিন্তু যদি শাড়ি-সেমিজ চাই ?'

'তা দিতে পারবো না বটে, কিন্তু তার বদলে পা-জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি দিতে পারবো। পরো না, বেশ দেখতে হবে। অনেকেই তো পরে আজকাল।'

একটু কি বিবেচনা করলো অশোকা। পরে নিতান্ত বালিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি কী যে বলো।' বলে তার সুটকেসে চাবি পরালো।

নিচে, বাথরুমে এসে দেখলো, সমস্ত কিছু তৈরি, প্রয়োজনেরো অতিরিক্ত। প্রক্ষালন সমাপ্ত করে চাকর-ঠাকুরের সঙ্গে সে দুটো সাংসারিক কথা কইলো নিতান্ত মেয়েলি কৌতূহলে। কিন্তু ভুলেও তারা একবার জিগ্‌গেস করলো না, সে কে, কেন এসেছে, কেনই বা এতদিন আসেনি।

উপরে গিয়ে দেখলো, টেবিলের সামনে কি-সব কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছে সুরজিৎ। যেন কতদিনকার পুনরাবৃত্ত অভ্যাস, সুরজিৎ চেয়েও দেখলো না। খসখসে শাড়ির বহুবিস্তৃত বিশৃঙ্খলায় অশোকা যখন দ্রুত পায়ে উঠে সুরজিতের পাশ দিয়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো, তারো মনে হলো এমনি যেন আরো কতদিন হয়ে গেছে এর আগে। নতুনত্বের তীব্রতার মাঝে জিনিসটাকে কখনো-কখনো অত্যন্ত পরিচিত ও প্রাত্যহিক

মনে হয়। হঠাৎ ময়ূর-সিংহাসনে গিয়ে বসলে মনে হয় এমনি যেন কতদিনই বসেছি।

কিন্তু খটকা বাধলো। অশোকা জিগগেস করলে : 'তোমার মোটা চিরুনি নেই?'

সুরজিৎকে তাকাতে হলো এবার, আর তাকিয়ে সে ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেল। আর কিছুতে নয়, শাড়িটার চওড়া ঢালা লাল পাড়ে। এই পাড়টা অত্যন্ত সেকেলে, আধুনিক কুমারী মেয়েদের পছন্দের বাইরে, এ-পাড়ের সঙ্গতির জন্যে কপালে ও সিঁথিতে যেন অনেকখানি সিঁদুরের প্রত্যাশা করতে হয়। এ লালটা সম্ভোগসৌভাগ্যের রঙ। যেন বড় বেশি উদ্ঘাটিত।

'কী দেখছ, মোটা চিরুনি নেই?'

'চুল তো আর ভেজাওনি, সরু চিরুনিতেই আঁচড়ে নিলে চলবে। তা ছাড়া,' সুরজিৎ হেসে বললে, 'রুক্ষ চুলেই তো বেশ ভালো দেখায়।'

চুল আঁচড়াবার আর দরকার হলো না। নিজের থেকেই সুরজিতের শাল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অশোকা বললে, 'বাবাঃ, কী শীত এখানে!'

'তোমাকে এখন চা দেবে না একেবারে খাবে?'

'একেবারে খাবো।' অশোকা অদ্ভুত করে হেসে উঠলো।

'কী খাবে? ভাত না লুচি?'

'তুমি?'

'তুমি যা খাবে তাই।'

'আমি ভাতই খাবো। ভাত না খেলে ঘুম হবে না। আমার সমস্ত শরীর এখন ঘুম চাইছে।'

'তবে দিতে বলি ঠাকুরকে?' সুরজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল।

'দাঁড়াও, ব্যস্ত কী!' অশোকা টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে ঝুঁকে

দাঁড়ালো। বললে, 'কাজ—এখনো কাজ? আমি এসেছি, তবু, আজকের রাতেও তোমাকে কাজ করতে হবে?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সুরজিৎ কাগজ-পত্রগুলি দূরে সরিয়ে রাখলো। বললে, 'না, ঠিক কাজ নয়, একটু দেখছিলুম কাগজগুলো।' তারপর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় একটু বা ম্লানকণ্ঠে বললে, 'তারপর—'

'তারপর, এই তো, ভাসতে-ভাসতে। উঃ, কী শীত এখানে! হাত দুটো আমার খেয়ে যাচ্ছে।' মুঠ-করা দুই হাতের উপর চিবুক রেখে দাঁড়িয়েছিলো অশোকা, হঠাৎ ডানহাতখানা দুর্বল ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই দেখ না, যেন বরফ দিয়ে তৈরি।'

এক মুহূর্ত সুরজিৎ দ্বিধা করলো হয়তো। তারপর সেই হাত সে একটু ছুঁলো কি না-ছুঁলো। ব্যস্ত হয়ে বললে, 'গ্লাভস্ পরবে? আমার কাছে ভালো গ্লাভস্ আছে।'

'আর মোজা?' অশোকা হাত সরিয়ে নিলো এবং এবার রাখলো তা শালের তলায়।

'মোজাও দিতে পারি। খুব নরম, একটুও কুটকুট করবে না।'

'আর, কান-ঢাকা টুপি? কম্ফর্টার?' হাসতে-হাসতে অশোকা সরে গেল। বললে, 'দস্তানা হাতে দিয়ে থাবার আমার অভ্যেস নেই। তুমি কাজ করো, আমি ঘুরে-ঘুরে তোমার বাড়ি দেখি।'

বলে সে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। নিঃশব্দে, কেননা এত শীতেও এখন সে খালি-পা।

কিন্তু কোথাও যেন তার এতটুকু আশ্রয় বা বিশ্রাম নেই। এমন একটুও কোথাও আগোছালো হয়ে নেই যে সে গুছিয়ে দেয়। বিছানাটা পর্যন্ত পাতা হয়ে গেছে।

ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো সেখানে

কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। এখানে বুঝি কখনো-কখনো স্থরজিৎ বসে, বসবার তার ইচ্ছে হয়, সব সময়েই তা হলে সে মস্ত টেবিলের সামনে খাড়া চেয়ারে বসে কাজ করে না। কিন্তু বাইরে কী কনকনে হাওয়া, এখানে এক মিনিট দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার। কোথা থেকে কি একটা প্রচ্ছন্ন ফুলের ম্লান গন্ধ আসছে, তার উপর এমন চক্ষু-জুড়ানো কালো অন্ধকার—কী ভেবে, শালটা গায়ের উপর আরো ঘন করে টেনে নিয়ে অশোকা একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লো।

তারপর স্থরজিৎ সত্যিই ফের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছিলো। হুঁস হলো যখন ঠাকুর এসে বললে, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। ডাকলো : 'অশোকা।'

আশা ছিল দেখতে পাবে পাশের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে সে বই পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সে নেই। বিছানাটাও অস্পৃষ্ট। দক্ষিণের দরজা খোলা দেখে চলে এলো সে দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলো চেয়ারে শুয়ে অশোকা ঘুমিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতে গেল, জ্বালালো না। আলোর চেয়ে অন্ধকারেই অনেক জিনিস বেশি স্পষ্ট করে দেখা যায়।

ডাকলো : 'অশোকা, ওঠো। খেতে যাবে না?'

গলার স্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা, তবু কোনো সাড়া নেই।

হাত দিয়ে অশোকার মাথায় সে মৃদু নাড়া দিলো। তারপর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি। 'এ কি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?' তবুও অশোকাকে মুহ্যমান দেখে দুই হাতে তার দুই বাহু ধরে সবল আকর্ষণ করে তাকে সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়ে দিলো। বললে স্থরজিৎ একটু বা শাসনের স্থরে : 'তুমি পাগল হয়েছ নাকি? এই অসম্ভব শীতে পাৎলা একটা শাল গায়ে দিয়ে বাইরে পড়ে আছ? নিমুনিয়া হবে যে! ঘুম পেয়েছে, বিছানায় শুতে পারোনি?

লেপ তবে আছে কী করতে? চলে এসো বলছি।' বলে তার হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো, আর দরজাটা দিল সজোরে বন্ধ করে।

এত ঝড়-ঝাপটার পর আশ্চর্য হেসে অশোকা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি?'

তারপর তারা নিচে খেতে গেল, টেবিলে, মুখোমুখি।

রাশি-রাশি খাবার। অশোকা বললে, 'তুমি আমার ঘুমটা মাটি করবে দেখছি।'

'কেন বলো তো?'

'এত সব খেলে আমার ঠিক অম্বল হয়ে যাবে। বুক জ্বলবে। ঘুমুতে পারবো না।'

'যদিও আমার কাছে ওষুধ আছে, তবুও তোমাকে অত খেতে বলবো না। যা পারো তাই খাও।'

'আর তুমি—তুমি এতগুলি সব খাবে নাকি?' অশোকা অবাক হবার ভঙ্গি করলো।

'না, আমি রাত্রে অত্যন্ত কম খাই।'

'তবে এত সব করেছ কেন?'

'আমি করিনি, ঠাকুর করেছে।'

'ঠাকুর করেছে! দুটো লোকের জন্যে দুশো রকম খাবার! ওকে এত সব বলেছে কে করতে? কী আক্কেল দেখ দিকি। এসব স্রেফ নষ্ট হবে তো?' অশোকা কর্ত্রীত্বের সুরে বললে।

'হোক নষ্ট। তবু তোমাকে বেশি খেতে বলে তোমার ঘুম নষ্ট হতে দিতে চাই না। কিন্তু, ভাবো দেখি,' সুরজিৎ সহজভাবে বললে, 'দৃশ্যটা যদি উল্টো হতো, মানে, তোমার ঘরে যদি আমি অতিথি হতুম, আর তুমি যদি আমাকে খাওয়াতে, তা হলে দুশো ছেড়ে দু' হাজার পদ করতে, আর

কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিতে না, জোর করে প্রতিটি গ্রাস আমার গলার মধ্যে গুঁজে দিতে, তাতে আমার অম্বল ছেড়ে পায়েস হয়ে গেলেও। বলো, তাই ঠিক নয় ?'

'ককখনো না।' চামচ দিয়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির প্রথমাংশটা দু' প্লেটে ভাগ করে দিতে-দিতে অশোকা বললে, 'বরং আমার খাওয়ানোতে যদি তোমার অসুখ করতো, রাত জেগে তবে তোমার আমি সেবা করতুম। যতক্ষণ না সুস্থ হতে ছেড়ে দিতুম না তোমাকে। বেশ তো, আজই তার পরীক্ষা হোক না।' অশোকা চেয়ারটা সামনের দিকে আরো টেনে আনলো : 'মনে করা যাক না, এ আমি তোমাকেই খাওয়াচ্ছি। তোমার বাড়ি, তোমার খরচ—ভেবে নিলেই হলো, আমার বাড়ি, আমার খরচ। খাও না তোমার যত ইচ্ছে। দেখ না, সেবা করতে পারি কি না।'

'মাঝখান থেকে আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে তোমার ঘুমটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে। দরকার নেই সেই এক্সপেরিমেণ্টে। ফেলে-ছড়িয়ে যা পারা যায় তাই খাওয়া যাক।'

খেতে-খেতে হঠাৎ নিম্ন কণ্ঠে অশোকা জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, তোমার ঠাকুর-চাকর আমাকে কী ভাবছে বলো তো ?'

'কী ভাবছে জিগগেস করাটা যখন সমীচীন হবে না, তখন অনুমান করতে পারি মাত্র।' সুরজিৎ সম্পূর্ণ করে তাকালো একবার অশোকার মুখের দিকে। বললে, 'কোন আত্মীয়া—ছোট বোন-টোন ভাবছে হয়তো।'

'তাই হবে। নচেৎ আর-কেউ যে এমন একা বাড়িতে একা চলে আসতে পারে তা হয়তো ওরা কল্পনাও করতে পারে না। আচ্ছা,' গরসটা মুখের কাছে ধরে নির্নিমেষ চোখে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে অশোকা প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা, আমাকে তোমার মনে ছিলো ? তার যখন পেলে তখন চিনতে পেরেছিলে অশোকা কে ?'

এই সূত্রে অশোকা সুরজিৎকে টেনে নিয়ে গেল প্রায় দশ-এগারো বছর আগে এক বে-সরকারী মেয়ে-হস্টেলে। যখন সুরজিতের বয়েস পঁচিশ কি ছাব্বিশ। যখন জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসে লুকিয়ে আরো একজনের সঙ্গে সে দেখা করতো। যখন একটা চাপা গুঞ্জন চলেছিলো চারদিকে শেষ মুহূর্তে কার সে হাত ধরে—জয়ন্তীর না অশোকার।

সে-পরিচ্ছেদটা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে সুরজিৎ হঠাৎ জিগগেস করলে : 'কাল ইণ্টারভিয়ুর পরই চলে যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ, হবির্বিনা-অবস্থাতেই যাওয়া ভালো।' অশোকা হাসিমুখে বললে, 'প্রহারেণ পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

আঁচিয়ে উপরে এসে দেখলো সাড়ে-এগারোটা। কি-রকম আতঙ্ক করে উঠলো অশোকার।

টিপাইয়ের উপর পান রেখে গেছে।

সুরজিৎ বললে, 'তুমি পান খাও ?'

'তুমি ?'

'খাবার পর খাই এক-আধটা।'

'আমি খাই না। তবে তুমি যখন খাচ্ছ—'অশোকা তুলে নিলো একটা পান।

'পান খেলেও ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজি।'

'রক্ষে করো, রাত দুপুরে এখন আমি দাঁত মাজতে পারবো না।' অশোকা পান রেখে দিলো।

কতক্ষণ পরে, ঘরের চারদিকে চেয়ে, জানলা-দরজা সব ঠিক আছে কিনা তাই হয়তো পর্যবেক্ষণ করে সুরজিৎ জিগগেস করলে, 'তোমার আর কি লাগবে ? রাত্রে জল যদি খাও—'

'রক্ষে করো। শীতের রাতে উঠে জল খাওয়া।'

'তবে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ো আর কি !'

'আর তুমি ?'

'আমার দেরি আছে।'

'আমিও তবে দেরি করতে পারবো।' বলে হঠাৎ অশোকা জিগগেস করলে : 'বাড়িতে কফি আছে ?'

'খাবে তুমি ? আমি নিজেই প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবার ভয়ে বলতে সাহস পাইনি।'

'তবে বলে দাও না, কোথায় কী আছে, তৈরি করে নিচ্ছি।'

'কিন্তু খাবে যে, ঘুমুতে তোমার অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক। এখন আর আমার ঘুম পাচ্ছে না। এখন জাগতে ইচ্ছে করছে।'

অশোকা নিজের হাতেই তৈরি করলো কফি। সুরজিৎকে এক কাপ দিয়ে নিজে নিলো আর এক। সুরজিৎ বসেছে ইজিচেয়ারে, অশোকা সামনে একটা লম্বা মোড়ায়—টিপাইটা দু'জনের মাঝখানে, বইগুলি মেঝের উপর রেখে দেয়া। বেড়া-দেয়া রুটিনের বাইরে যেন তারা চলে এসেছে। নিচে চাকরদের সাড়া-শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।

কফি শেষ হয়ে গেছে কখন। অনেকক্ষণ তাদের আর কোনো কথা নেই। আর যেন কিছুতেই তারা লঘু আর তরল হতে পারছে না।

প্রকাণ্ড একটা স্তব্ধতার ঢেউ পেরিয়ে গিয়ে সুরজিৎ বললে, আবার সেই আগের কথা : 'দোর দিয়ে এখন শুয়ে পড়ো।'

অশোকারো মুখ দিয়ে সেই আগের কথাই বেরিয়ে এলো : 'আর তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমিও শোবো এবার। পাশের ঘরে আমার জায়গা হয়েছে।'

মাঝের দরজা দিয়ে অশোকা দেখলো একবার পাশের ঘরের চেহারা। দেখলো সেই স্প্রিং-এর খাটে কখন একটা বিছানা করা হয়েছে—হাসপাতালের রুগীর মতো—পায়ের নিচে একটা মোটা কম্বল—ওয়াড়-ছাড়া। দরিদ্র, সঙ্কীর্ণ বিছানা।

অশোকা বললে, 'তা কি হয়? তোমার বিছানায় তুমি শোবে। ওখানে আমি শোব—একরাত্রির তো মামলা।'

সুরজিৎ অস্ফুটভাবে হাসলো। বললে, 'পাগলামি করো না। তুমি অতিথি, পথশ্রান্ত।'

'অত বড়ো খাটে শুলে আমার ভয় করবে। ঐখানেই দিব্যি আমি কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে পারবো। ঘরময় অনেক জিনিস, ককখনো একা মনে হবে না নিজেকে।'

'তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, এমন-কি আমাকে পর্যন্ত তোমার ভয় নেই। সে-ভয়ও যাতে না থাকে—' সুরজিৎ সরে এলো দু ঘরের মাঝের দরজার কাছে। বললে, 'দরজার খিলটা তোমার দিকেই রইলো।' পরে স্বর অত্যন্ত লঘু করে বললে, 'মশারি খাটানো আছে, দরকার হলে ফেলে নিয়ো। মশা যদিও এখন নেই। আর রাত কোরো না, কথায়-কথায় অনেকক্ষণ তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি।' বলে সুরজিৎ তার ঘরে অপসৃত হ'ল।

অমনি তার পিছনের দরজাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। নির্ভুল একটা শব্দ হলো—খিল-লাগানোর শব্দ। তারপর সুইচ অফ করার শব্দও সে শুনতে পেলো। তারপর, এ-ঘর থেকে দেখলো সে ও-ঘরের অন্ধকার।

অনেক রাতে সুরজিৎ একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলো যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারছে সে, অথচ খুলছে না দরজা। অশোকাকে ডাকতে যাচ্ছে, গলায় ফুটছে না কোনো স্বর। অথচ স্পষ্ট

সে দেখতে পাচ্ছে সে-আগুনের থেকে অশোকা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

এমনি একটা আতঙ্কের মধ্যে থেকে তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। যাক, আগুন নয়, আলো। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

অন্যদিন ভোরবেলা জানলা দিয়ে ডেকে চাকর জাগিয়ে দেয়, আজ সে নিজেই উঠলো, এবং সেটা অপ্রত্যাশিত প্রত্যূষে। মনে পড়লো অশোকার কথা, এবং মনে হতেই নিঃসঙ্কোচে সে পাশের দরজা খুলে উত্তরের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অশোকার ঘরে ঢুকলো। ঘরে অশোকা নেই, সেটা বেশি আশ্চর্য নয়, কিন্তু খাটজোড়া প্রকাণ্ড বিছানার এতটুকু কোথাও কোঁচকায়নি। সুরজিতের শালখানা ভাঁজ করে ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর রাখা। তার সুটকেসটিও অন্তর্হিত।

উপরে-নিচে সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গায়ই অশোকাকে পাওয়া গেল না। সুরজিৎ তারপর পথে বেরুলো। আর কোথাও নয়, মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে। বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'নতুন কোনো মিসট্রেস নেবার কথা হয়নি, আর অশোকা মুখার্জি বলে কারুর ইণ্টারভিয়ু দিতে আসার কোনো কথা নেই।'

এর পর স্টেশনেও সে যেতে পারতো—ভোরবেলা জলে-স্থলে দু'দিকের পথই খোলা আছে। অতএব পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন নেই মনে করে সুরজিৎ বাড়ি ফিরলো। ফিরে এসে পরখ করে দেখলো দু'-ঘরের মাঝখানের দরজা তেমনি অটুট বন্ধ আছে।

বন্ধ যদি আছে, তবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে পাশের ঘরে সে আলো দেখলো কেমন করে?

সমস্তটাই কি স্বপ্ন?

সঞ্চয়

গলা-বন্ধ কোটের পাঁচটি বোতামের একটিও যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ, উদার বক্ষে, সীতানাথবাবু সেটা গায়ে রাখেন। পঞ্চমতমটিও যখন বিদায় নেয়, তখন কিছুকাল কোটের ছিদ্রীকৃত মধ্যস্থল দুটি সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে। প্যাণ্টালুন যেহেতু জুতোর কাছেই এসে শেষ হয়েছে সেহেতু মোজা পরার কোনো মানে হয় না, একটু অবহিত থেকে পায়ের উপর পা না তুলে বসলেই চলে যায়। আর, উদ্যত যম-মুষ্টির মতো টুঁটি-টেপা কলার পরার চেয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ দেয়া সহজ।

আরো একটু বলি, ওঁকে চিনতে সুবিধে হবে। শীতে-বর্ষায় পায়ে তাঁর একই ক্যাম্বিশের জুতো, তাঁর সমতল জীবনযাপনের নিষ্কলঙ্ক উদাহরণ। নিষ্কলঙ্ক বলছি, কেননা জুতো কেনার পর থেকে এ পর্যন্ত তাতে খড়ির দাগ পড়েনি। যেহেতু ওটার দাম চোদ্দ আনা সেহেতু ওটাকে চোদ্দবছর পদবাসে রেখেছেন বলে গর্ব করেন, আর বলেন, যত কড়াক্কড়ি পোষাক নিয়েই হয়েছে, জুতোর উপর কেউ হাত দিতে পারে নি। কবিরাজ বলেছে বলে বাড়িতে কাঠের উনুনে রান্না হয়, এবং প্রত্যহ ভোরে উঠে তাঁর প্রথম প্রাতঃকৃত্য হচ্ছে রান্নার জন্যে ঠিক গুনে-গুনে দশখানি লকড়ি বের করে দেয়া। যজ্ঞের রান্নাও যদি রাঁধো, দশখানির বেশি লকড়ি পাবে না। আর, মিষ্টি তিনি নিজে না খেলেও ছেলেপুলের সংসার থেকে সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া চলে না, তাই তিনি বাতাসা চালিয়েছেন। আর, সে-বাতাসা সংগৃহীত হতো বাজার থেকে নয়, কালীবাড়ি থেকে। মা-কালীর প্রসাদ সেই বাতাসা, ভারি সস্তায় তা বিকোয়, এক ধামা চার পয়সায়। মুঠো-মুঠো খেয়েও চলে প্রায় মাসখানেক।

শান্ত, শীতল জীবন, বয়েসও প্রায় ছেচল্লিশ। শুধু দুটো জিনিসে তাঁর ভয়, এক চিনি, আরেক উপরালা। নতুবা বইয়ের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাওয়ার মতই তাঁর দিনগুলি।

এ হেন সীতানাথবাবুর স্ত্রী প্রভাতকুসুম। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ, বেশ খটখটে আধুনিকা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়েসেই বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, স্ত্রীর পরামর্শেই তাঁর সমস্ত ব্যয়সঙ্কোচ, কেননা প্রভাতকুসুম সর্বক্ষণই এটা বোঝে যে লোকের অর্থের পরিচয় কী সে দেখায় তাতে নয়, কী সে লুকোয় তাতে। অতএব বেয়ারিং ইয়ার্কিতে খরচ না করে দুটো পয়সা এদিক-ওদিক সরিয়ে ফেলতে পারলেই আখেরে তার একটা হিল্লে হবার সম্ভাবনা।

প্রভাতকুসুমের বোনঝির বিয়েতে সবাইকে নিয়ে সীতানাথবাবু কোলকাতা গিয়েছেন—গল্পের সূত্রপাত এইখানে। মোটে চারদিনের ছুটি, বিয়ে দেখে সীতানাথবাবু একা ফিরে এসেছেন স্বস্থানে, ছেলেপুলে নিয়ে প্রভাতকুসুম থেকে গেছে তার বোনের বাড়িতে—গল্পের এইখেনেই পরিণতি।

খুচরো ছুটিতে যখনই কোথাও যান, পাড়ায় থাকে আপিসের য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, কমলকৃষ্ণ, তার উপরে বাড়ির ভার থাকে। ঠাকুর-চাকরকে বিশ্বাস নেই। অথচ বাড়িতে তাঁর কী-ই বা আছে, শুকনো একখানা গামছা, কোণছেঁড়া একটা ছাতা, আর, বড়ো জোর, কড়িকাঠের সঙ্গে ঝোলানো লেপের ছালাটা। নচেৎ, সমস্ত অস্থাবর মালামালই তো তিনি আপিসের মালখানায় বন্ধ রাখেন। তবু, একটা মগ খোয়া গেলেও তো ছ'টা পয়সা গুনগার যায়।

খাসকামরায় বসে একটু শ্লথ-সুস্থ হবার আগেই গুম্ফগম্ভীর মুখে কমলকৃষ্ণ এসে উপস্থিত।

'ঘর-দোর সব ঠিকঠাকই ছিলো।' মামুলিভাবে বললেন সীতানাথবাবু।

'কিন্তু এদিকে একটা কাণ্ড ঘটেছে।' কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে কমলকৃষ্ণ বললে।

'কী কাণ্ড ? কোথায় ?'

'আপনার বাড়িতে।'

'আমার বাড়িতে ? বলেন কী ? কবে ?' সীতানাথবাবু খাড়া হয়ে উঠলেন।

'এই ছুটির মধ্যে।' তারপর কাহিনী যা বললে কমলকৃষ্ণ, সেটা কোনো চুরি বা ডাকাতি নয়, ছোটখাটো একটি উপন্যাস। কাহিনীটা এই :

গত পরশু দুপুর বেলা, একটা কি দেড়টার সময়, দূরে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে কমলকৃষ্ণ রাস্তায় বেরিয়ে আসে, যেন কোথায় দাঙ্গা বেধেছে এমনি গোলমাল। এগিয়ে এসে দেখে, সীতানাথবাবুর বাড়ির কাছেই সে চেঁচামেচি। অসংখ্য লোক ঢুকে পড়েছে তাঁর কম্পাউণ্ডে, বেশির ভাগই হিন্দুস্থানী বাথুয়া, আশে-পাশে আলগা লোকও জমেছে মন্দ নয়। ব্যাপার কী ? খোঁজ নিয়ে জানলো কমলকৃষ্ণ, কেলেঙ্কারির একশেষ, বাথুয়াদের কার একটা মেয়ে রয়েছে নাকি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে, আর সীতানাথবাবুর ঠাকুরই নাকি তাকে বাইরে আসতে দিচ্ছে না। বাবুর বাড়ি বলেই ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ, কিন্তু ভালো চায় তো, তাদের মেয়ে এক্ষুনি ফিরিয়ে দিক, নইলে কাঠ আর কেরোসিন এনে আগুন ধরিয়ে দেবে তারা। ভিতরে গিয়ে খবর নিলো কমলকৃষ্ণ, একটুও বানানো নয়, বারান্দার এক কোণে দরজার আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে বাথুয়াদেরই একটা মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

'কী বাথুয়া-বাথুয়া করছেন,' সীতানাথবাবু হঠাৎ বিরক্তমুখে ধমক দিয়ে উঠলেন : 'বাথুয়া বলে কাকে ?'

বাথুয়া হচ্ছে একরকম হিন্দুস্থানী মাঝি, চালানী নৌকোয় যারা দেশ-বিদেশে মাল বয়, আর যাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রী-কন্যারা দুধ বেচে শাক-

সব্জি বেচে মুড়ি-চিঁড়ে বেচে অন্নসংস্থান করে—সবিনয়ে বুঝিয়ে দিলো কমলকৃষ্ণ। বললে, 'আপনার বাড়ির কিছুটা পশ্চিমে ওদের বসতি। আন্দাজ তিরিশ-চল্লিশ ঘর আছে।'

'তারপর মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে তাড়িয়ে দিলেন কিনা বলুন।'

'ঠাকুরকে বললুম সোজাসুজি বার করে দিতে। মেয়েটা পাছে মার খায় তাই সে প্রথম সাহস পাচ্ছিলো না। পরে—'

'মার কেবল একলা মেয়েটাই খাবে সে ভেবেছে নাকি?' সীতানাথ-বাবুর সর্বাঙ্গ রাগে রক্তময় হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো এখুনিই বাড়ি ফিরে পা থেকে জুতো খুলে ঠাকুরের পিঠটা জর্জরিত করে তোলেন। জুতোর শক্তির কথা ভেবে একটু তিনি চিন্তিত হলেন হয়তো; ভাবলেন, জুতো ছেড়ে ছাতার শরণাপন্ন হওয়াটাই শোভনীয় হবে। কিন্তু প্রহারের প্রাবল্যে ছাতাটা ভেঙে গেলে অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। অতএব, যা থাকে কপালে, রান্নার কাঠই একখানা কমবে না-হয়।

'পরে, খিড়কির দোর খুলে চুপি-চুপি মেয়েটাকে বার করে দিলুম। ও-দিকটাতে জঙ্গল আর বাঁশবন, কোনো লোক ছিলো না। আর, লোক থাকলেই বা কী', গুম্ফপ্রান্তে কমলকৃষ্ণ একটু হাসলো, 'ছাড়া পেয়েই মেয়েটা সোজা ছুট দিলো, এক নিশ্বাসে মিশে গেল হাওয়ায়।'

'ছুট দিলো কী মশাই?' সীতানাথবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'মেয়েছেলে কখনো ছুটতে পারে?'

'ঠিক একটা হরিণের মতো ছুটে পালালো। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। মনে হলো যেন রোদ্দুরে একটা ধারালো তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল হঠাৎ।'

'থাকেন তো চালান আর পেমেন্ট-অর্ডার নিয়ে, এত কবিত্ব শিখলেন কোথায়?'

কমলকৃষ্ণ লজ্জিত হলো।

'ছুটলো যে, বয়েস কত মেয়েটার?'

'আঠারো-উনিশ হবে।'

'সে তো একটা ধাড়ি মশাই। নির্লজ্জের মতো ছোটে কী করে?'

'কিন্তু ভারি ছিপছিপে আর পাৎলা। তা ছাড়া, তখন তার ধরা পড়ার লজ্জার চেয়ে মার খাবার ভয়ই বেশি।'

'আপনার তো তাকে মার খাওয়ানোই উচিত ছিলো। খিড়কির দোর খুলে দিয়ে পালাতে দিলেন কেন?' সীতানাথবাবু বক্র চোখে জিগ্‌গেস করলেন।

'নইলে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হতো। তা ছাড়া, মেয়েটার অবস্থা দেখে তখন একটু মায়াও যে না হয়েছিলো তা নয়।'

'যান, যান, চাকরির মায়াটাই সর্বাগ্রে।' হঠাৎ বিষয়বহির্ভূত ভাবে বলে উঠলেন সীতানাথবাবু। 'পরের মেয়ের উপর বেশি মায়া দেখানোটা ঠিক নয়।'

কথাটা নির্ব্যক্তিক ভাবে বলা হলো বলেই কমলকৃষ্ণকে স্পর্শ করলো না। চলে যাচ্ছিলো থেমে পড়ে সে বললে, 'ও-ঠাকুরকে রাখা তো নিশ্চয়ই ঠিক হবে না।'

'ঠিক? হারামজাদাকে আমি কাঠ-পেটা করে তাড়াবো।'

'তাই আরেকটা ঠাকুর জোগাড় করে রেখেছি।'

'বেশ, পাঠিয়ে দেবেন।'

সাধারণতো ঠাকুর বললে যা বোঝায় সীতানাথবাবুর ঠাকুর তার সংজ্ঞাভুক্ত নয়। তার নাম কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়ি বরিশাল জেলায়—ঝালকাঠি না নলচিঠিতে। থার্ড-ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলো, পয়সার অভাবে আর এগুতে পারেনি, অগত্যা বামুনের ছেলের পক্ষে

সনাতন যে পথ, চলে এসেছে সে রান্নাঘরে, ষোলবছর বয়সে। সীতানাথ-বাবু তখন ভোলায়, মোটর-টায়ারের স্যাণ্ডেল পায়ে একমাথা উস্কখুস্ক চুল নিয়ে কিশোরী যখন তাঁর কাছে এসে হাত পাতে। ছ' টাকা মাইনের উড়ে ঠাকুরকে এক কথায় বরখাস্ত করে তিন টাকা মাইনেতে কিশোরীকে তিনি বহাল করেন। তারপর বারো-তেরো বছর কেটে গেছে, কিশোরীর মাইনে এখন সাড়ে-সাত। তবু, সর্বসাকুল্যে, ওকে পেয়ে অনেক সুবিধে, কেননা মাইনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও তাকে দিতে হয় না, দাড়ি কামাবার জন্যেও নয়।

ভীষণ বাবু ছিলো কিশোরী। ধোপাবাড়িতে সীতানাথবাবুর যেত যেখানে তিনখানা, কিশোরীর যেত ছয়খানা। বালিশের ওয়াড়ও যে ধোপাবাড়িতে দেয়া চলে, এ শুধু সীতানাথবাবু কিশোরীকে দেখে শিখেছেন। কিছু বলতে পারতেন না, কেননা কিশোরীর আলাদা ধোপা। নাপিতের কাছে নখ কাটবার যখন সময় হতো তখনই দাড়ি কামাতেন সীতানাথবাবু, কিন্তু কিশোরীর মুখটা নির্মূল নির্মম হয়ে সব সময়েই ঝকঝক করছে। সাতশো টাকা মাইনেতে তাঁর একটা টাইম-পিস হয় না, থানার ঘণ্টা বা কোর্টের ঘণ্টা (এদের কোনো একটার কাছে তিনি বাসা নেন) শুনে তাঁর কাজ চলে, আর মাত্র সাড়ে-সাতটাকা মাইনেতে কব্জিতে সে দিব্যি ঘড়ি বেঁধেছে। শোনা যায়, পকেট থেকে বার করে নাক-টেপা চশমাও নাকি পরে মাঝে-মাঝে এবং নিরাপদ দূরত্বে চলে এলে কখনো-কখনো তার হাতে একটা ছড়িও নাকি ঘূর্ণ্যমান হয়। এখানে আসবার সময় হাতে-বওয়া মাল-পত্র দিয়ে সীতানাথবাবু তাকে দু'দিন আগে পাঠিয়ে-ছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়ে যারা এসেছিলো ইস্টিশানে, সবাই ভেবেছিলো সেই সীতানাথবাবু। নাজিরকে উজীরবাবু বলে সম্ভাষণ করার পর নাকি সবাইর ভুল ভাঙে। পরে নাকি সে সহরে বলে বেড়িয়েছে, সীতানাথবাবুর

সে বড়ো ছেলে, আগের পক্ষের, এবং সেই হেতুই একটু বাবু ও বখা। কেউই অবিশ্বাস করতে পারেনি।

'ঠাকুর!' বাড়ি ফিরে এসে সীতানাথবাবু আশ্বিনের মেঘগর্জন করলেন।

কিশোরী ভয়ে-ভয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো তার চাউনি।

'যা শুনেছি তা সত্যি?'

কিশোরী মাথা নামিয়ে রইলো।

'কি, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে! সত্যি?'

'সত্যি।'

'সত্যি!' ধাঁ করে সীতানাথবাবু কিশোরীর গাল, কান ও ঘাড় লক্ষ্য করে প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন। উঠলেন হুঙ্কার করে: 'তোমাদের জিম্মায় বাড়িঘর রেখে যাই এ সব কেলেঙ্কারির জন্তে? ভদ্রলোকের ছেলে, এ সব দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে? ছি ছি ছি!'

কিশোরী চুপ করে রইলো।

'কে ওই মেয়েটা? পেলে কী করে?'

কিশোরী কথা বললো না।

'নাম কী?'

'দাসীয়া।' অস্ফুটস্বরে কিশোরী বললে।

'আমাদের দুধউলির মেয়ে বুঝি?'

'না।'

'তবে কার মেয়ে? ঠিক করে বলো।' সীতানাথবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন।

'জানি না।'

'জানো না!' সীতানাথবাবুর দুই পাটি দাঁত দৃঢ়সংযুক্ত হলো এবং

মুখের অভ্যন্তরে একটা বর্বর শব্দ উত্থিত হয়ে নির্ভাষ অবস্থাতেই মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পরে তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বললেন, 'এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি ছেড়ে।'

কিশোরী কাকুতি করে বললে, 'মুহূর্তের জন্যে একটা ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা-টমা আমার নেই। আমি ক্ষমা করলেও তোমার মা কিছুতেই করবেন না। যাও, বেরিয়ে যাও।' সীতানাথবাবু তার ঘাড়ে আরেকটা ধাক্কা মারলেন। আর বললেন এমন যে দুশ্চরিত্র সে যেন ভাঙা মাসের মাইনের কথা মুখ ফুটে না উচ্চারণ করে।

রাত্রেই নতুন ঠাকুর বহাল হলো, আপাততো পাঁচ টাকায়, এবং কথা হলো রান্না যদি সে ভালো করে তবে তিন মাস পরে তার এক টাকা উন্নতি হবে। আসলে, তাঁর দিক থেকে ব্যাপারটা লাভজনকই হলো, ভাবলেন সীতানাথবাবু, এবং প্রথম রাত্রি থেকেই নতুন ঠাকুরের রান্নার তিনি ত্রুটি ধরতে লাগলেন।

কিন্তু, কে জানে, অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে তাঁর ঘুম এলো না। যেন হঠাৎ তাঁর নিজেকে বড়ো বেশি একাকী মনে হলো। এত বড়ো ফাঁকা বাড়িতে একলা থাকবার তাঁর অভ্যেস নেই কোনোকালে, এত বড়ো তক্তপোষে। যেন দেয়ালে কিসের ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে বারান্দায় যেন কার চাপা পায়ে আনাগোনা, যেন দরজার কাঠ দুটো আপনা থেকেই শব্দ করে উঠছে। তারপর অনেক রাতে যখন তাঁর ঘুম এলো তিনি একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, এমন এক জায়গায় গিয়েছেন যেখানে পোস্টাপিস নেই। তাঁর সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়েছে, প্রভাতকুসুমকে কোলকাতায় টেলি করা দরকার, কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না পোস্টাপিস। মাঠ-জঙ্গল পাহাড়-নদী পার হয়ে তিনি ছুটছেন, উৎসুক হয়ে

তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে, কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের একটা তন্তুও তাঁর চোখে পড়ছে না।

সকালে বরাদ্দ ঘোল দিয়ে গেল চাকর। নথি-পত্র থেকে মুখ তুলে চশমাটা এক ঠেলায় কপালের উপর তুলে দিয়ে সীতানাথবাবু হঠাৎ জিগগেস করলেন, 'তুই ঐ মেয়েটাকে চিনিস?'

ফেকুলালের বুঝতে মোটেই দেরি হলো না। বললে, 'না, হুজুর।'

'তুই তখন ছিলি কোথায়?'

'আমি তখন পানের দোকানে গিয়েছিলাম পান কিনতে।'

'আমরা চলে গেলে বাড়িঘর তোরা এমনি করেই পাহারা দিস! কেন, পান খেতে দোকানে যাওয়া কেন, বাড়িতে জোটে না?' সীতানাথ-বাবু রুখে উঠলেন, 'ফের যদি বাড়ি ছেড়ে যাবি কোনোদিন দুপুরে, ঠিক তাড়িয়ে দেব বলে রাখছি। হিন্দুস্থানী চাকর রেখে আমার কিছু লাভ নেই, আমি বাঙালী চাকর রাখবো।'

বলে তিনি পুনরায় নথিতে মনোনিবেশ করলেন। চশমাটা কপাল থেকে হাত দিয়ে নামাতে হলো না, কপাল ও নাকের যুগপৎ আকুঞ্চনেই ওটা নাকের উপর আপনিই নেমে বসলো।

সান্ধ্যভ্রমণের পৃথিবীটা তাঁর খুবই পরিমিত ছিলো, কিন্তু সেদিন যখন তিনি পশ্চিমের গ্রাম্য ও বন্য পথের দিকে পা বাড়ালেন, পৃথিবীকে হঠাৎ যেন তাঁর খুব বড়ো বলে মনে হলো এবং স্পষ্ট অনুভব করলেন যে উত্তর-মেরুতে না গিয়েও উত্তরমেরু-আবিষ্কারের রোমাঞ্চটা দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এক হাত রাস্তাও কি তাঁর শান্তিতে চলবার উপায় আছে? প্রতি হাতে এক হাতে কারু আদাব, দুই হাতে কারু নমস্কার। প্রতি পদে তিনি চিহ্নিত, অনুসৃত, ভয়প্রাপ্ত। অদৃষ্টের কী বিড়ম্বনা, তাঁর জন্যে একটুখানি কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই, তাঁকে চেনেনা এমন একটিও কোথাও লোক

নেই কথা বলবার। তাঁর জন্যে সবাই যেন ভীষণ ব্যস্ত, ভীষণ জাগ্রত, হাই তুললে তুড়ি দেবার জন্যে ও হাঁচি দিলে জীব বলবার জন্যে সবাই এগিয়ে রয়েছে। আর কতদূর গিয়েছেন কি, কেউ অযাচিত বলে বসবে বাকি পথটা দুর্গম, কর্দমাক্ত, কেউ বলবে একজোড়া সাপ আছে এই ঝোপের মধ্যে, কেউ বা বলবে কাদের গোয়ালে গরুর বসন্ত হয়েছে। এ-অঞ্চলটার ভূগোল বা ইতিহাস নিয়ে কারু সঙ্গে যদি বা তিনি আলোচনা করেন সে এমন একটা ভাব দেখায় যেন বাথুয়ারা সমগ্র এশিয়া মহাদেশেরই বহির্ভূত।

তবু, বলা বাহুল্য, সীতানাথবাবু গ্রামের সেই পাশ্চাত্ত্য পথটুকু ধরেই বৈকালিক আনাগোনা করেন। যেটুকু সম্ভব এর-ওর শশা বা চালকুমড়ো, পুঁইশাক বা ঢ্যাঁড়স নিয়ে উৎসাহ দেখান, গরুর চরবার জন্যে মাঠ কোথায় পাওয়া যায় সেই সমস্যায় আন্দোলিত হন, আবাদের মুখে ঠিক বৃষ্টি না পাওয়ায় ফসল কেমন পাওয়া যাবে তাই নিয়ে মাথা ঘামান। আর যখন বাড়ি ফিরে এসে অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে ক্যানভাসের ইজি-চেয়ারে পড়ে থাকেন, রক্তের চাপ বাড়ার জন্যেই হয়তো বোজা চোখের মধ্যে ছোট-ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখেন, মনে হয়, বাইরে যেন অসম্ভব রোদ, আর সেই রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে একটা ধারালো তলোয়ার।

এত বড়ো বাড়ি ছেড়ে সীতানাথবাবুর হঠাৎ নদীর ওপারে ডাক-বাংলোয় গিয়ে থাকবার ইচ্ছে হলো। সামনেই বালির চর, বেশ নির্জন জায়গা। যেন সেখানে যেতে পারলেই তাঁর ঘুম আসে। কিন্তু ডাক-বাংলোর মালী যখন তাঁকে জিগগেস করবে, বাড়ি ছেড়ে তিনি এই বনবাসে কেন, তিনি কী উত্তর দেবেন?

অসম্ভব। অগত্যা তিনি স্বদেশে নিধনং শ্রেয় কল্পনা করে ফেকুলালেরই শরণাপন্ন হলেন। বললেন, 'তুই তো একটা ভূত, তোকে দিয়ে কোনো

কাজই হবার জো নেই। পারবি, পারবি একটা ঠাকুর জোগাড় করে আনতে ?'

'ঠাকুর !' ফেকুলাল ভ্যাবাচাকা খেল। বললে, 'কেন, আছে যে একটা ?'

'ওটা আবার রাঁধতে পারে নাকি ? টক রান্না করতে গিয়ে টকই দেয় না, ওটা তো জাম্বুবান, তোর মাসতুতো ভাই। শোন', সীতানাথ-বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'যে করে হোক কিশোরী ঠাকুরকে ধরে আনতে হবে।'

ফেকুলাল আরো ভ্যাবাচাকা খেল। বললে, 'সে তো কবে চলে গেছে।'

'সে চলে গেছে কিন্তু মেয়েটা তো যায়নি। নিশ্চয় তার কাছে কিশোরী ঠাকুরের ঠিকানা আছে। নিশ্চয়ই তার কাছে সে চিঠি লেখে। নিশ্চয়। ওকে জিগগেস করলেই জানা যাবে ঠিক।'

ফেকুলাল ঢোক গিললো। বললে, 'আমি তো মেয়েটাকে চিনিনা।'

'আমি চিনি।' সীতানাথবাবু জোর দিয়ে বললেন। 'মেয়েটার নাম দুখিয়া। নাম জিগগেস করলেই ওকে তোর বার করতে দেরি হবে না।'

'কিন্তু ঠাকুরের ঠিকানা বললে আমি তা মনে রাখতে পারবোনা, হুজুর।'

'তুই যে একটা আস্ত গাড়োল, মনে রাখবি কী করে ? বেশ, মনে রাখতে না পারিস দুখিয়াকে বলিস আমার সঙ্গে যেন এসে দেখা করে।'

ফেকুলাল যেন নিজেকে অনেক হালকা মনে করলো। বললে, 'কখন বলবো দেখা করতে ?'

'কী বলিহারি তোর বুদ্ধি ! সকালবেলাটা তো কাজকর্মেই ডুবে থাকি, তখন সময় কোথায় ? দুপুরে তো আপিস, স্বচক্ষেই দেখতে পাস। বিকেলে বাড়ি এসে খবরের কাগজ পড়তেই লেগে যায় দু' ঘণ্টা। বেড়িয়ে

ফিরে সন্ধের পর একটু যা ফাঁক পাই, তখনই দুটো যা কথা কইবার সময়। বুঝলি, তখনই আসতে বলবি।'

ফেকুলাল সম্মত হলো। এবং তখুনি সীতানাথবাবুর মনে হল যেন সমস্তর কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। যেন সবাই শুনে ফেললো তাঁর কথা, শুনে ফেললো তাঁর চাপা দীর্ঘশ্বাস। যেন তাঁর জুতোর ভিতর থেকে পায়ের কদর্য আঙুলগুলি রাস্তার মাঝখানে সবাইর সামনে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো।

ফেকুলালকে তিনি মূর্খ ভেবেছিলেন, কিন্তু গলার স্বর সে অনেক খাদে নামিয়ে এনেছে। তার মুখ দেখে উৎসাহ না পেলেও কণ্ঠস্বরে অনুপ্রাণনা ছিলো। সে বললে, 'দুখিয়া বলে কেউ ওখানে নেই হুজুর।'

'থাকলে আর তোমাকে সবাই ভূত বলবে কেন?'

'আমি, হুজুর, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। দুখিয়া এক ছিলো, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি, গত ছট-পরবের সময় কলেরা হয়ে মারা গেছে।'

'আর আশ্চর্য, তুই কিনা এখনো বেঁচে আছিস।'

'তবে—' চারদিকে চেয়ে ফেকুলাল থামলো।

'তবে—' সীতানাথবাবু তাকে ধরিয়ে দিলেন।

'তবে লখিয়া বলে একজন আছে।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লখিয়া—সীতানাথবাবু আলোড়িত হয়ে উঠলেন, লখিয়া, লক্ষ্মীই মেয়েটার নাম। মামলার বাদিনী রাজলক্ষ্মী তাঁর রায়ে রাজকুমারী হয়েছে বটে, জরিমননেছা হয়েছে করিমননেছা, কিন্তু এমন মারাত্মক বিপর্যয়ের সেখানে আশঙ্কা ছিলো না। ফেকুলাল আপিল-আদালতের মতো ভুল তাঁর শুধরে নিয়েছে কিন্তু ডিক্রি নাকচ করেনি।

নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সীতানাথবাবু বললেন, 'হাঁ, কী বললে লখিয়া?'

'আসতে রাজি আছে কিন্তু টাকা চায়।'

'টাকা !' কিশোরীর উপর প্রদত্ত চড়টা যেন দ্বিগুণ বিক্রমে সীতানাথ-বাবুর উপর ফিরে এলো। বহুবিস্মৃত ঝিনঝিনিয়া রোগে তিনি যেন হঠাৎ আক্রান্ত হলেন, মনে হলো এখুনি যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে পড়ে যাবে। ঢালের যে একটা ও-পিঠ আছে সেটা তাঁর যেন খেয়ালই হয়নি। ঊর্ধ্বচক্ষু হয়ে জিগগেস করলেন, 'টাকা কিসের ?'

'তা জানি না।'

'কিশোরী ঠাকুরের ঠিকানাটা এসে বলে যাবে তাতে টাকা লাগে কী করে ! তুই কি ল্যালাখ্যাপা নাকি ?'

'কী করে বলবো ?'

'ক' টাকা শুনি ?'

'এক-আধটা নয়, পঁচিশ টাকা।'

'কি, কী বললি ? বল তো শুনি আরেকবার—'বলে কী শোনবার চেষ্টা করতে-করতে সীতানাথবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ারের মধ্যেই টলে পড়লেন।

চাকর-ঠাকুর তাঁকে ধরাধরি করে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলো। লোকজন ডাকতে যাবে এমন সময় চোখ চেয়ে সীতানাথবাবু তাদের বারণ করলেন। ঠাকুরকে বললেন, 'আমাকে একটু মকরধ্বজ শুধু মেড়ে দাও। ঐ কাগজের বাক্সটাতে আছে, আর একটু গরম দুধ। ব্যস্ত হয়ো না তোমরা, চোটটা আমি খুব সামলে নিয়েছি।'

এর পর প্রভাতকুসুম আর দেরি করতে পারলো না, দুদিনের মধ্যেই সদলে ফিরে এলো। এসেই নতুন ঠাকুর দেখে সে ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। বললে, 'এ কী, পুরোনো ঠাকুর গেল কোথায় ?'

দুর্ধর্ষ ঘৃণায় সীতানাথবাবু বললেন, 'ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কেন ?'

সীতানাথবাবু পুঙ্খ পুঙ্খ করে সবিস্তার সে কাহিনী বললেন, যতটুকু শুনেছেন ও যতটুকু শোনেন নি সমস্তটুকু একত্র করে। তাঁর শরীরটা বিশেষ সুস্থ নয় ও অস্ত্র-আয়ুধগুলি খুব শক্তিমান ছিলো না বলেই যে প্রহারটা বিশেষ পরাক্রান্ত হতে পারেনি তারও জন্যে একটু অনুতাপ করলেন।

'আহাহা, তাতে কী হয়েছে?' প্রভাতকুসুম বিদ্রূপ করে উঠলো: 'তারি জন্যে এত দিনের একটা tried handকে তুমি এক কথায় তাড়িয়ে দিলে? আসলে, অপরাধটা ও করেছে কী! তোমার সবতাতেই সাধুগিরি ফলানো। কমলবাবুর তো মেয়েটার জন্যে মায়া হলো, আর ওর জন্যে তোমার একটুও মায়া হতে পারলো না? তোমরা তো বিচার করো না, butchery করো।'

কিশোরীকে না তাড়ালেই যে ভালো ছিলো তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু ঘটনাটা প্রভাতকুসুম এমন তরল ভাবে গ্রহণ করবে সীতানাথবাবু তা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই তাকে খুসি করবার জন্যে বললেন, 'যাই হোক এই ফাঁকে আড়াই টাকা লাভ হয়েছে—নতুন ঠাকুরটার মাইনে মোটে পাঁচ টাকা।'

আরো তাকে তিনি খুসি করতে পারতেন হয়তো—

কিন্তু পঁচিশ টাকা লাভের কথাটা শুধু অন্তর্যামীই জানুন।

যথাপূর্ব

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল ইনটারভিয়ু।

কেন এবং কী দেখে যে এখন এ-কথা মনে পড়ে গেল কে জানে। হয়তো রাস্তায় দেখা গিয়েছিলো একটি নারীমূর্তি।

দুটো বাজতেই সমর নেমে গেল খাসকামরায়, সিগারেট ধরিয়ে দস্তখৎ ডাকলো। কিন্তু আর্দালি এক পা এগিয়েই পিছিয়ে গেল দু' পা। তারপর কামরার পর্দা সরিয়ে যখন সে পুনরায় প্রবেশ করলে, হাতে তার ভিজিটিং কার্ড।

ছাপানো নয়, কালো কালিতে পরিচ্ছন্ন নাম লেখা : সরমা চৌধুরী।

অনেক কারণেই বিস্ময়কর। প্রথমত পাত্রী, দ্বিতীয়ত স্থান, তৃতীয়ত নামটা। অবিশ্যি খাসকামরাটা তার স্ত্রীলোকের একেবারে অগম্য নয়, কেননা পর্দার আড়ালে কখনো-কখনো তাকে জবানবন্দি নিতে হয়েছে, আর সরমা নামটাতেও এমন কোনো লোকোত্তরতা নেই। তবু মন যা বলে তাই ঠিক হয়ে দাঁড়ায়।

এ-সম্বন্ধে সমরের খুব একটা চমৎকার নজির আছে। (সব-কিছুতেই আজকাল সে নজির খোঁজে!) অনেক বছর আগের কথা। সেবার সে ম্যাট্রিক দেবে। তার সমপাঠিনী একটি ভাগ্নী প্রায়ই তাকে শাসাতো যে তাদের ক্লাশের বাসন্তীর সঙ্গে কিছুতেই সে এঁটে উঠবে না। অনেকানেক নামের মধ্যে বাসন্তীর নামটাও সে শুনেছিলো সেদিন! কী-জানি-কেন নামটা মুছে যায়নি। হয়তো তার একটা কারণ ছিল এই যে সেই ভাগ্নীটি গিয়েছিলো মুছে। বি-এ পর্যন্ত গেজেটের পৃষ্ঠায় বাসন্তীকে সে অনুসরণ করেছে, দেখেছে অনেক পিছে-পিছে আসতে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। তবু পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইংরেজি ক্লাশে—তখনো সহ-শিক্ষাটা এমন দরকারী হয়ে ওঠেনি—প্রথম যে-মেয়েটি সেদিন অতি কুণ্ঠিত মুখে ঘরে ঢুকেছিলো, তার দিকে চেয়ে সমরের মন নিঃশব্দে বলে উঠেছিলো :

বাসন্তী! আকৃতি বা বয়স, সাজ বা ভঙ্গি কিছুরই সঙ্গে তার বিন্দুতম পরিচয় ছিলো না, তবু মন যা বলেছিলো তাই সত্যি, খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেই সে অচিহ্নিতা!

এই কথাটাই প্রবলভাবে ফের মনে পড়লো সমরের, যখন আগন্তুকা ঘরে ঢুকলো।

'নমস্কার।' অতি মৃদু, ম্লান স্বর।

অভ্যাসবশতই সমর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। যা ভেবেছিলো তাই। কিন্তু এটা কি ভয় না সুখ কিছু বুঝতে পারলো না। বিবর্ণ মুখে বললে, 'এ কি, তুমি—আপনি, আপনি কোত্থেকে?'

সরমা মনে-মনে হাসলো। মুখে বললে, 'দেখা করতে এসেছি।'

অভ্যাসবশতই সমর পাশের একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিল, যেমন আর সবাইকে দেয়, একটু বা নির্লিপ্ততার সঙ্গে। সরমা বসলো, কুণ্ঠিত হয়ে।

'দেখা করতে এসেছেন!' সমর এমন ভাবে বললে যেন কোনো আমলার সঙ্গে কথা কইছে: 'তা বাড়িতে না গিয়ে এখানে?'

সরমা এবারো হাসলো না। বাড়িটা চিনি না, এ-কথা সে অনায়াসে বলতে পারতো, কিন্তু দ্রুমহীন দেশে এরণ্ডকে চিনি না বললে বনস্পতির অবমাননা হয়। তাই অপরাধীর মতো সে বললে, 'কথাটা অফিসিয়াল, তাই এখানে বলতে এসেছি।'

'অফিসিয়াল?' কথাটা সমর সম্পূর্ণ ইংরিজি কায়দায় উচ্চারণ করলে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'কথাটা কী?'

'গার্ল-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের পোস্টের জন্যে আমি একজন অ্যাপ্লিকেণ্ট।'

বাঙলা কথোপকথনে ইংরিজি শব্দ সমর মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনা। কারু কথার উত্তর দেবার আগে তাকে ইংরিজি শব্দগুলোর

বাঙলা তর্জমা করিয়ে নিতে বাধ্য করে। প্রতিশব্দ না থাকে প্রতিশব্দ তৈরি করিয়ে নেয়। আর, প্রক্রিয়াটা যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ বাক্যালাপ স্থগিত থাকে।

বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদের জন্যে আমি একজন প্রার্থী বা আবেদনকারী—অভ্যাসবশত কথাটা সমর নিজেই তর্জমা করে নিল। তর্জমা করলো বটে, কিন্তু আশ্চর্য, অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

লুকিয়ে, মানে তার অভ্যস্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নয়,তাকালো সে একবার সরমার দিকে। হঠাৎ তার মন মোচড় দিয়ে উঠলো। দেখলো, সরমাকে কেমন ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অনেক আগেও তাকে সে এমনি করে দেখতো, কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। মানে, যে ভালোবাসে সে চিরদিনই বিষণ্ণ, যে পায় না তার চিরদিনের ক্লান্তি—এমনি একটা শেলীয়ান ভাবালুতা। কিন্তু শেলী ছেড়ে এখন সে আরেক যুগে এসেছে, তাই তার আজকের দেখাটা দূরবীক্ষণে নয় অণুবীক্ষণে। সরমা যে ক্লান্ত তা আজ দেখা যাচ্ছে তার শরীরের শীর্ণতায়, আর সে যে বিষণ্ণ তা তার নম্র, অনুচ্চারিত বেশবাসে। হাতে দু' গাছি করে মোটে সরু সোনার চুড়ি, গলার হার সঙ্কোচে অপ্রকাশমান। সাড়িটা অসামান্য রকমের সাধারণ। সমর একবার তাকালো তার কপাল ও সীমন্তের দিকে, সেখানটাতে প্রখর, যেন-বা নির্লজ্জ শুভ্রতা।

'তা, আমার কাছে কেন?' সমর তবু নির্ব্যক্তিক ভাবেই বললে।

'তুমি প্রেসিডেন্ট, তোমার কাছেই তো আসবো।' সরমা একটুও বিচলিত হলো না।

একরকম ছুটি হয়ে গেলেও আদালতের আনাচে-কানাচে এখনো বহু লোক আনাগোনা করছে, চতুর্দিকে শ্রুতিমান দেয়াল, এরি মাঝে প্রত্যক্ষ

দিবালোকে, এ কী কেলেঙ্কারি! সমরের নিরপেক্ষ বিচারবোধে কে যেন রূঢ় আঘাত করলে। লোকে শুনলে বলবে কী!

তাই সে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'নির্বাচন, কমিটি মানে পরিষদের হাতে। একা প্রেসিডেণ্ট, মানে অধ্যক্ষ কী করবে? আমার তো আর একটার বেশি ভোট নেই।'

অত্যন্ত ম্লান, ব্যথিত গলায় সরমা বললে, 'কিন্তু তুমি বললে তোমার কথা কেউ ফেলতে পারবে না। তুমি বললেই আমার এ চাকরিটা হয়ে যায়।'

'কেন? ইংরিজি মার্জনা করবেন,' বাঙলা প্রতিশব্দটা চট করে সমর খুঁজে পেলোনা: 'নেপটিজম নাকি?'

'তা কেন?' করুণ করে সরমা বললে, 'আমি তো আর তোমার আত্মীয় নই।' বলেই যেন সে নিজেকে সংশোধন করলে: 'মানে, রক্তের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।'

'তা তো বটেই। তবু গুণ অনুসারেই নির্বাচন হওয়াটা কি ঠিক নয়? তোমাদের—আপনাদের ক'জনকে ডাকা হয়েছে?'

'তিন জনকে।'

'সবাই গ্র্যাজুয়েট?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ বি-টি নয়?'

'না।'

'তবে তো চান্সেস্, মানে, সম্ভাবনা সবাইর সমান।' দু' হাতের মুঠোর মধ্যে মুখ নিয়ে সমর আরেকটা সিগারেট ধরালো।

'সমান নয়। তারি জন্যে তো তোমাকে আগে থাকতে একটু বলতে এসেছি।' সরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বললে: 'একজন অনার্স, আরেকজন ডিস্‌টিঙশন্, আর আমি সাধারণ পাশ-কোর্স!'

'যাঁর অনার্স তাঁরই তো পাওয়া উচিত। এর মধ্যে আর কথা কী! গুণই পুরস্কৃত হবে।' শেষের কথাটা ইংরিজিতে এসেছিলো, অতি কষ্টে সেটাকে সমর বাঙলায় রূপান্তরিত করলে।

'কিন্তু আজকালকার চাকরির বাজারে গুণই কি সব? খাতির—খাতিরের কি কোনই দাম নেই?' কালো চোখে সরমা কোমল একটি কটাক্ষ করলো।

'তবে আপনি আমার কাছে ক্যানভাসিং, মানে তদবির করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, যদি কানে-কানে বলতে পারতুম, বলতুম, তাই, তদবির করতে এসেছি। তুমি যে আমার মুরুব্বি, এই কি আমার ভয়ানক গুণ নয়?' সরমা সামান্য হাসলো।

কতক্ষণ সমর কোনো কথা বলতে পারলো না।

চমক ভাঙলো সরমার পরের কথাটা শুনে। বিমর্ষ অথচ সস্মিত গলায় সে বললে, 'আচ্ছা, এতক্ষণ হয়ে গেল, আমাকে তুমি এখনো আপনি বলছ! আমি কি তোমার আপনি?'

হঠাৎ সমর কলিং-বেলটার উপর হাতের তালু দিয়ে একটা বাড়ি মারলো। ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলো আর্দালি। নিষ্ঠুর মুখে সমর বললে, 'বলে দাও, দস্তখৎ আজ আর হবে না।'

আর্দালি চলে যাচ্ছিলো, সমর আবার তাকে ডাকলো।

'গাড়ি এসেছে?'

'এসেছে।'

'হ্যাঁ', কলার-পিষ্ট গলাটা একবার হাত দিয়ে একটু অনুভব করে সমর বললে, 'এবার আমি বাড়ি যাবো।'

সেই সেদিনের সমর! কি রকম ছিল, আর কী হয়েছে! চোখের

সামনে দেখেও সরমা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কি রকম দুর্বল ছিল, যখন তাদের বাড়িতে আসতো, কত ভীত, বিনীত, পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো দুঃখী। সেই সমর আজ কত অহঙ্কারী, কী ভীষণ নিষ্ঠুর, কী আশ্চর্য নিস্পৃহ। রোগা, বাজে-পোড়া চেহারা ছিল, এখন শরীরে বেশ একটু মাংস হয়েছে, কান্তি ফুটেছে, আর সব চেয়ে ফুটেছে একটা সচেতনতার আভা। সে যে একটা কিছু, তার মর্যাদায় আর প্রভুত্বে, এই কথাটা তার ললাটে উল্লিখিত। আগে কত দিন তার ট্রাম-ভাড়ার পয়সা নেই দেখে লুকিয়ে তার পকেটে টাকা ফেলে দিয়েছে সরমা, আর আজ তারই দুয়ারে সামান্য একটা চাকরির জন্যে সে মাথা কুটছে।

আস্তে-আস্তে চারিদিক কেমন নিঃশব্দ হয়ে এলো। লোকজন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। আগে যদি বা ভিড় ছিল, এখন যেন বা নির্জনতার ভয়।

সমর উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'এখানে কোথায় উঠেছ ?'

সরমা তেমনি বসে রইলো। বললে, 'আমার এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়িতে। তোমারই কপিইস্ট। কিন্তু সেখানে থাকা চলবে না।'

'কেন ?'

'তিলধারণের স্থান নেই। ভাবছি ডাক-বাঙলাতে রিমুভ করবো।'

'নদীর ওপারে ?' সমর যেন একটা হোঁচট খেলো। বললে, 'আর সব ক্যাণ্ডিডেট, মানে চাকুরিপ্রার্থিনীরা কোথায় ? তাঁরাও কি ডাক-বাংলাতেই উঠেছেন নাকি ?'

'না, তাদের কেউ না কেউ এখানে আছে। তাদের অসুবিধে হচ্ছে না।'

'তুমি একা ডাক-বাংলায় থাকবে ?'

'কি আর করা,' নিম্নগলায় মৃদু হেসে সরমা বললে, 'একাই যখন

আছি। আর ভয় কিসের, তোমাদের রাজত্বেই তো থাকবো। যদি দয়া করো, একটা না-হয় কনেস্টবল মোতায়েন রেখো।'

'পাগল! তার চেয়ে আমার বাড়িতে চলো!' সমর ব্র্যাকেট থেকে টুপিটা তুলে নিল। বললে, 'আমার স্ত্রীকে তো দেখনি।'

'না।' সরমা চোখ নামালো।

'বেশ ভালো মেয়ে। তোমাকে দেখে খুসিই সে হবে।'.

সরমা হাসলো। বললে, 'তোমার স্ত্রী যখন, ভালোই তো হওয়া উচিত। আর, আমাকে দেখে খুসি হবে সেটাও কিছু আশ্চর্য নয়। বেশ, যখন ডাকলে, তখন নিশ্চয়ই যাবো।' তার পর উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

সমর আরেকবার তাকে ভালো করে দেখলো। বললে, 'কতদিন আছ এখানে?'

'যদি রাখো তো আর যাই-ই না।'

'রাখি মানে?'

'রাখো মানে যদি চাকরিটা পাইয়ে দাও।' সরমা ঢোক গিললো: 'কাল রবিবার দুপুরে ইনটারভিয়ু, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটারটা যদি কাল হাতে-হাতেই দিয়ে দাও, তবে আর যাই না, এখানেই থেকে যাই।'

'কিন্তু ইস্কুলে তো এখনো শিক্ষয়িত্রীদের জন্যে বাড়ি-ঘর তৈরি হয়নি।'

'তা চাকরি যে দিতে পারে সে কি থাকবার একটা বাড়ি জোগাড় করে দিতে পারবেনা? একা একজনের মতো অন্তত একটা একচালা?'

'একা একজনের মতো!' কথাটা শ্লেষ করে শেষ করতে গিয়ে সমর থেমে গেল। বললে, 'ঐ গাড়ি।'

গাড়ি শুনে সরমা প্রথম ভেবেছিলো, মোটর গাড়ি। কিন্তু দেখলো,

অশ্ববাহিত। বুঝলো, গম্ভীর পদমর্যাদার দরুণ এই ট্যাক্সোটা সমরকে দিতে হচ্ছে। কিন্তু গাড়ির চাকাগুলো এমন বক্র-স্খলিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সরমার ভয় হলো ছুটতে গিয়ে গাড়িটা না দ্বিধা হয়ে যায়।

তবু বসলো সে সমরের মুখোমুখি। বললে, 'মোটর কেন নি ?'

'মোটর ? এখানে রাস্তা কোথায় ?'

'তা যেটুকু আছে, তাই মন্দ কী ! রাস্তা না থাক, সঙ্গিনী তো আছে।'

সরমা আশা করেছিলো এর উত্তরটা হয়তো এই হবে, 'সঙ্গিনী থাকলে ঝর্ঝরে ঘোড়ার গাড়িই যথেষ্ট,' কিন্তু উত্তর যা শুনলো তা এই :

'সঙ্গিনী যিনি আছেন তিনি অনেক রাস্তা পর্যন্তই আছেন, তাই ব্যস্ত নই।'

সরমা লক্ষ্য করছিলো সমর মোটেই স্বস্থ বোধ করছে না। দুই পাশের কৌতূহলী জনতা তাকে যেন পীড়িত করছে। যে যেন এখানে বড়ো বেশি চিহ্নিত, দৃষ্টিবিদ্ধ। আর, অন্যের দৃষ্টির কাছে তার দৃষ্টি যেন অত্যন্ত লাজুক।

সরমা বললে, 'তুমি দুর্নামকে খুব ভয় করো, না ?'

সিগারেট সম্বন্ধে সমর একটু কৃপণ। তবু আবার আরেকটা সে সিগারেট ধরালো। বললে, 'কে না করে ?'

'আমি আগে খুব করতাম, কিন্তু এখন আর করি না। এখন উল্টে তোমার কাঁধে এসে ভূত চেপেছে। অথচ এমন একদিন ছিল,' সরমা চোখে ঝিলিক দিল : 'দুর্নাম নিয়ে কত কবিত্বই না করেছ।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমর বললে, 'চিরদিন মানুষের সমান যায় না।'

'এতক্ষণে একটা সত্যকথা বললে। সমানই যদি যাবে তবে আজ আমার এমন দশা হবে কেন ? কেন সামান্য একটা পঞ্চাশ টাকার চাকরির জন্যে উড়ে বেড়াবো ?'

'কেন এমন দশা হলো ?' সমরের প্রশ্নটা শোনালো ভীষণ প্রতিহিংস্র। সহানুভূতির লেশমাত্র নেই।

'বোধহয় একজনকে খুব দুঃখ দিয়েছিলাম, তার প্রতিফল।'

'সেই একজনটি কে ?'

'সেই একজন একজনই।'

সমরের বুকের ভিতরটা আবার হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। একটা নিশ্বাস সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সে বললে, 'কিন্তু তার মতো সুখী পৃথিবীতে তো কাউকে আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'তবু, আমার এমনি অভিশাপ, আমার অদৃষ্টে এককণা সুখ নেই।' সরমার চোখ যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো : 'জীবনে এত সুখী হয়েও সে আমাকে ক্ষমা করলো না। তবু, ক্ষমা না হোক, স্নেহ না হোক, অন্তত আজ যদি সে একটু করুণা করে, আমার চাকরিটা হয়ে যায়।'

'তোমাকে তো বলেছি,' সমরের সমস্ত মুখ কেমন কঠিন হয়ে এল : 'এ চাকরি তোমার হবে না।'

'হবে না ?'

'না। আগে-আগে একেকটা কথা অনেকবার করে অনেক রকম ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতাম। এখন যা বলি, একবারই বলি।'

'তুমি কি যে বল, তা তুমি জান না।' সরমা পাংশু মুখে বললে।

'হয়তো জানি না। কিন্তু তোমাকে এই চাকরি দেব জানলে ককখনো ইনটারভিয়ুর আগে তোমাকে নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় গাড়ি চাপতাম না। আমি সম্পূর্ণ স্থির করেছি বলেই তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছি। নইলে যে বিচারক সেই আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এটা অসহ্য।'

'অসহ্য! কিন্তু ককখনো তুমি এমন কথা বলতে না যদি জানতে আমি আজ কী বিপদে পড়েছি!' সরমার গলা ধরে এলো।

কথাটা যেন সমর উপভোগ করলে। বললে, 'তা আমি কী করবো ? আমাকে ত আমার বিপদ দেখতে হবে। তা ছাড়া যে-বিপদই হোক, কা বিপদ তা আমি জানতে চাই না, তা তো আর আমার তৈরি নয়।'

'যদি বলি, তোমার ?'

'আমার ?' সমর এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে স্থির চোখে তাকালো সরমার দিকে। তারপর শূন্য ভাষায় শব্দ করে হেসে উঠলো : 'শুনতে পারি বিপদটা কী ?'

নিজের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় সরমা বললে, 'আমার এই অভাব, দারিদ্র্য—'

'অভাব ?' নিজের চোখে এতক্ষণ দেখেও যেন সমর এই প্রথম দেখছে।

'কুৎসিত অভাব না হলে কি কোনো ভদ্র মেয়ে সামান্য পঞ্চাশ টাকার চাকরির জন্যে এমন মিনতি করে ? ইনটারভিয়ুতে রাজি হয় ?'

'অভাব—কিন্তু, কেন, তোমার তো খুব বড়ো ঘরে বিয়ে হয়েছিলো !' সাতকাণ্ড শেষ করে সমর এতক্ষণে বলতে পারলো কথাটা।

'হয়েছিলো। সবই হয়েছিলো। কিন্তু কিছুই আর হয় না।' সরমা স্তিমিত গলায় বললে, 'বড়ো ঘরই দেখেছিলাম, কিন্তু ঘর যাতে বড়ো হয় তার দিকে চেয়ে দেখিনি।'

সেটা কী জিনিস সমর জানতে চাইলো না। শুধু বললে, 'তারপর, দাঁড়িয়েছে কী ?'

'স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে ! কেন ?'

'সন্দেহ করে।'

'কী সন্দেহ ?'

'যে একজনকে আমি ভালোবাসি।'

'কে একজন?'

'বলেছি তো একজন কখনো দু'জন হয় না। আমিও তাই কিছু লুকোলাম না,' সরমা আরক্ত মুখে বললে, 'না অতীত, না বর্তমান, না অনন্ত ভবিষ্যৎ। ফলে, ছিটকে এই বেরিয়ে পড়েছি বাইরে, একেবারে নিঃসম্বল। তোমার হাত ধরে একটু কি দাঁড়াতে দেবে না?' আবার সরমার মুখ ম্লান হয়ে এলো : 'যাতে স্বাধীনভাবে দুটো খেতে পাই, শান্ত ভদ্রভাবে জীবনটা টেনে নিয়ে যেতে পারি।'

'ছেলেপুলে হয়নি?' প্রশ্নটা বেথাপ্পা শোনালো, কিন্তু জানা দরকার।

'না।'

অনেকটা ফাঁকা জায়গার পর গাড়ি আবার লোকালয়ের মধ্যে এসেছে। কিছুকাল চুপ করে থেকে সমাহিত উদাসীন গলায় সমর বললে, 'কিন্তু ন্যায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে তোমার চেয়ে সেই অনার্স-পাশ ভদ্রমহিলার দাবিই কি বেশি নয়?'

'ন্যায়—ন্যায় কি তুমি শুধু ঐখানেই দেখতে পাচ্ছ? তোমার ন্যায়-অন্যায় সমস্তর উপর কি আর কিছু নেই? এই, রাখো।' সরমা হঠাৎ গাড়োয়ানকে থামতে বললে।

'এখানে?'

'হ্যাঁ, এইখানেই আমার সেই কপিইস্ট মামার বাড়ি।' সরমা গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বললে, 'বিদেশে রাত্রিকালটা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকাই হয়ত ন্যায়সঙ্গত!'

সমরও নেমে পড়লো। এগিয়ে দিয়ে এলো দু' পা। এবং প্রকাণ্ড রাস্তাতেই বললে, 'তুমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ো না। আমি দেখবো চেষ্টা করে। কালকে এসো।'

'ধন্যবাদ।' বলে সে হাসিমুখে হালকা পায়ে বেড়া-ঘেরা বাড়ির মধ্যে অন্তর্ধান করলে।

বাড়ি ফিরে এসে সমর সকল কথা বৃত্তাকারে বললে শোভনাকে—ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃত্তে—কিন্তু আসল যেটা কেন্দ্র সেটাই গোপন করলে। যে-পরিচয়টা বলবার নয় তাই বললে, সরমা তার বৌদিদির মাসতুতো বোনঝি। কোলকাতায় বৌদিদির বাপের বাড়ি গড়পারে উনিশ শো কোন সালে যেন তাকে একবার দেখেছিলো, আর এতদিন পরে দেখা, এই গেঁয়ো সহরে। কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়ায়, আর কতটা ঘোলা হয়ে। বিয়ে হয়েছিলো মস্ত ঘরে, কোন জমিদার না ব্যবসাদার না আড়তদারের সঙ্গে। বিয়ে হয়েছিলো বছর তিনেক আগে, এই তাদেরই বিয়ের বছর। কিন্তু এত সুখ হজম করতে পারলো না, স্বামীর সঙ্গে অবনিবনা হলো। বি-এ পাশ মেয়ে, আত্মসম্মানটা একেবারে চুলের আগায়। শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। শক্ত পুরুষ, ফিরেও তাকালো না, অনুতাপে একেবারে অনুতপ্ত। ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা অত্যন্ত শোকাবহ। সামান্য একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরির জন্যে এখানে এসে উপস্থিত। সামান্য জীবিকা-নির্বাহটাই এখন সমস্যা। অবিশ্যি সমর চেষ্টা করলে চাকরিটা হলেও হতে পারে, কিন্তু মুস্কিল এই, সরমার চেয়ে উপযুক্ততরো প্রার্থিনী আছে।

শোভনা খোকাকে বোতলে করে দুধ খাওয়াচ্ছিলো। গল্পের যেখানটায় তাকে বিঁধলো সেইখানেই সে আঙুল রাখলো। বললে, 'ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কেন ?'

'সব কথা ভেঙে বলতে চায় না। তবে যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল, গায়ে ওর হাত তুলতো।'

শোভনা একটা আতঙ্কের শব্দ করলে।

'আর মনের উপর পীড়নটা অনেক সময় শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে দুঃসহ।'

'তবে তো ওঁকে চাকরিটা দিয়ে দেওয়াই উচিত।' শোভনা সহানুভূতিতে বললে।

'কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে এই, ওর চেয়ে ভালো পাশকরা মেয়ে আছে।'

'আহা, এ আবার কী কথা! এমন দুঃখে পড়েছে, আমাদের জানা-শোনা মেয়ে, ওঁরই তো পাওয়া উচিত একশো বার।'

সমর মনে-মনে একটু বল পেলো কিনা কে জানে। বললে, 'কাল এখানে আসবে বলেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আসবে!' শোভনা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো: 'চোখ তা হলে সার্থক করি। বি-এ পাশকরা মেয়ের সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। হেজিপেজি লোক আমরা, ভয় করে।'

এটা শোভনার বিনয়, কেননা এ সহরে সে যে মহিলা নম্বর প্রথম, সেটা তার বিলক্ষণ জানা আছে। কতগুলি আর্দালি-চাপরাশি সে খাটাতে পারে তা তার মুখস্ত। পাশ-টাশ না করলেও সভায় দাঁড়িয়ে, বক্তৃতা নয়, পুরস্কার যে বিতরণ করতে পারে সে-গৌরবও তার হয়েছে।

'ভয় তো তার,' সমর টিপ্পনি কাটলো: 'তোমার মত এমন একজন প্রতাপান্বিতা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কেননা তোমার হাতেই তার চাকরি।'

'বেশ তো, নিয়ে এসো না, প্রতাপটা দেখিয়ে দিই।' শোভনা হাসলো: 'এখানে আছে কোথায়?'

'আমারই আপিসের এক নকলনবীশের বাড়িতে। কি রকম মামা হয় নাকি সম্পর্কে।'

নকলনবীশ যে একজন খুব মর্যাদাবান ব্যক্তি নয় এটা শোভনা সহজেই ধারণা করলো। বললে, 'এখানে উঠলেই তো পারতো। আমিও তো সম্পর্কে তার মাসি হই।'

সমর একটু সাহস পেলো হয়তো। বললে, 'আমিও তাই বলেছিলাম। কে জানে, কাল হয়তো আসতে পারে।'

কিন্তু কাল একেবারে সকালেই আসবে এতটা সমর আশা করেনি। আপিস-ঘরে বসে সে কাজ করছিলো, দেখলো সরমা তার বাড়ি ঢুকছে, সোজা অন্তঃপুরে। ইনটারভিয়ুর আগে এখানে চলে আসাটা ভীষণ বিসদৃশ। বিরক্তিতে মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছে শোভনা, এ কে। এবং আত্মপরিচয় দিয়েই মুহূর্তে সরমা আত্মীয় হয়ে উঠলো। পরে বললে, 'আপনি যদি ওঁকে একটু বলেন, আমার হয়ে যায় চাকরিটা।'

অভয় দিয়ে শোভনা বললে, 'আমি না বললেও হবে।'

'কিন্তু উনি মোটেই রাজি নন। আমার চেয়ে ভালো ক্যাণ্ডিডেট আছে বলে তাঁর আপত্তি। কিন্তু বলুন, ন্যূনতম যোগ্যতা যখন আমার আছে আর আমি যখন এমন অভাবগ্রস্ত তখন আমারই হওয়া কি উচিত নয়?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখুনি বলছি গিয়ে ওঁকে।' শোভনার কণ্ঠস্বরে প্রতাপ ফুটে উঠলো। পরে অন্তরঙ্গতার সুরে বললে, 'কিন্তু আপনি এ-বেলা আমার এখানে খাবেন, কেমন?'

'খাবো? এ তো খুব ভালো কথা।' সরমা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো: 'তবে খেয়ে-দেয়ে এখান থেকেই ইনটারভিয়ুতে বেরুতে পারবো। মেয়ে-ইস্কুলটাতো কাছেই।'

'ঐ যে দেখা যাচ্ছে।' জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শোভনা ফের বললে, 'এর জন্য আবার একটা পরীক্ষা দিতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, ওঁরা সব আমাদের যাচাই করে নেবেন। বিয়ের বেলায় একবার, চাকরি দেবার বেলায় আরেকবার।'

'এসব হাঙ্গামার কোনই দরকার ছিল না, যদি আমাকে একবারটি লিখতেন আগে।' শোভনা আবার আরেকটু প্রতাপ দেখালো : 'চুপচাপ আপনাকে ঠিক ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আমি ওঁর সঙ্গে একটা কথা বলে আসছি।'

আপিস-ঘরে সচরাচর শোভনা আসে না। অনেকখানি ঢালা বারান্দা পেরিয়ে তবে ঢুকতে হয়। খোঁজ নিয়ে জানলো ঘরে এখন আর কেউ নেই। প্রতাপান্বিত ভঙ্গিতে স্যাণ্ডেল ফটফট করতে-করতে ঘরে এসে ঢুকলো, বসলো একটা চেয়ারে। আমূল চমকে উঠলো সমর, দেখলো শোভনা।

শোভনা বললে, 'উনি তো এসেছেন—'

'চলে যেতে বলো।' সমর কর্কশ গলায় বললে, 'ইনটারভিয়ু, মানে মৌখিক পরীক্ষার আগে এখানে এসেছে কেন? লোকে দেখলে বলাবলি করবে যে।'

'কী বলাবলি করবে?'

'বলবে, আমারই কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়াকে জোর করে চাকরি দিয়েছি, আর-সব উপযুক্ত প্রার্থীদের দাবিয়ে রেখে। একটা ভীষণ কানাঘুষো সুরু হয়ে যাবে। না, না, তুমি এখন ওকে চলে যেতে বলো,' সমর অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো : 'যা-ও সম্ভাবনা ছিল এতেই তা আরো নষ্ট হয়ে যাবে। বলে দাও, ইনটারভিয়ু. মানে, ইনটারভিয়ুর পরে যেন আসে। এখানে এসে যেন চা খায়।'

'চলে যেতে বলবো কী! ওঁকে যে এখানে এবেলা আমি খেতে বললাম।'

'চমৎকার! তার মানে খেয়ে-দেয়ে একসঙ্গেই আমরা ইস্কুলে যাই ইনটারভিয়ুতে। লোকে স্পষ্ট বুঝুক।'

'বুঝলেই বা। ক্ষতি কী?'

'কেন, খাতির নাকি? কিসের খাতির? গুণ দেখতে হবে না? না, শুধু চেহারা দেখলেই চলবে?'

'তা, ভালো চেহারা দেখে খাতির না হয় একটু করলেই।' শোভনা ঠাট্টা করলো।

'আমার বয়ে গেছে।'

'ভালো চেহারা মানে আমার চেহারা দেখে।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ, আমার চেহারাটা কি শিক্ষয়িত্রীর চেয়ে ভালো নয়?'

সমর হাসলো। পাছে হাসিটা না সম্পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক হয়, বললে, 'শতসহস্রগুণে ভালো।'

'তবে আমার এই চেহারা দেখেই চাকরিটা ওঁকে পাইয়ে দিতে হবে। আমি ওঁকে কথা দিয়েছি।'

'তোমার কথা কমিটি শুনবে কেন?'

'কমিটি না শুনুক তুমি শুনবে। সামান্য একটা চাকরি দিতে পারো না, তবে এত ফুটুনি কিসের?'

সমর আবার হাসলো। বললে, 'কিন্তু তোমার এত ওকালতি কেন?'

'তোমার হাত থেকে মামলাটা জিতবো সেই আনন্দে। তা ছাড়া আমি মোটা ফি পেয়েছি।' সমর তাকিয়ে রইলো।

হাসিমুখে শোভনা বললে, 'প্রথমতো আমার উনি সঙ্গী হবেন, দ্বিতীয়ত আমাকে বাড়িতে এসে পড়াবেন বিনামূল্যে। কাছেই কোথাও তাঁর বাসা হবে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে সব সময়।'

'তবে, বেশ তো', সমর ঢোক গিললো: 'তোমার প্রাইভেট টিউট্রেস, মানে গৃহশিক্ষয়িত্রী করেই রেখে দাও না ওকে। পঞ্চাশ টাকা মাইনেই না-হয় দেয়া যাবে। কষ্ট করে হাত আর বাড়াতে হবে না। নিজের থেকেই—'

'ইস্! পঞ্চাশ টাকা!' শোভনা ঠোঁট উল্‌টোলো: 'টাকা অমনি গাছে ধরে?'

তা-ও তো ঠিক, সমর ভেবে দেখলো।

'মোট কথা, চাকরিটা চাই। ওঁর খাতিরে না হোক, আমার খাতিরে। বুঝলে?' শোভনা উঠে দাঁড়ালো।

'তোমার যে দেখি ভীষণ দয়া।'

'তোমারই বা হবে না কেন?' টেবিলের ধারে একটু ঝুঁকে পড়ে শোভনা বললে, 'ধরো, আমি যদি অভাবে পড়ে তোমার কাছে এসে চাকরি চাইতাম, তোমার দয়া হতো না? দিতে না আমাকে?'

'তুমি হলে দিতাম বৈ কি।' সমরও উঠে পড়লো।

'এ-ও তেমনি মনে করো।' শিশুর মতো শুভ্র সরলতায় শোভনা হেসে উঠলো। বললে, 'মনে করতে আর দোষ কি! ওঁর ভেতর থেকে আমিই না-হয় চাইছি চাকরিটা।' দরজার কাছে গিয়ে সে ঘাড় ফেরালো: 'সত্যি, দিয়ো কিন্তু। আমার প্রতাপটা একটু দেখাই।'

সমর বেরিয়ে পড়লো ছড়ি নিয়ে। আর কোথাও নয়, দেখা করলো গিয়ে গিরিশ মুদির সঙ্গে। গিরিশ তো শশব্যস্ত। ব্যাপারটা কিছুই নয়, সমরের বাঙলোর পিছে রাস্তার ওপারে ছোট যে একখানি কাঠের বাড়ি সে তৈরি করেছে সেটাকে ভাড়া দিতে হবে। গিরিশের ঘাড় সেই যে কাৎ হলো আর ওঠে না। হুজুর যখন চান। আর ভাড়া আট

টাকার বেশি পাবে না। গিরিশের ঘাড় আর কাঁধ এক হয়ে গেল। হুজুর যা বলেন।

ততক্ষণ, শোভনা যতক্ষণ সমরের আপিস-ঘরে, সরমা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলো বাড়ি-ঘর। সব-কিছুতেই তার ভারি কেমন কৌতুক লাগছিলো, সেদিনের সেই ছন্নছাড়া সমর কেমন এখন জাঁকিয়ে বসেছে। ভাবলে কেমন অবাক লাগে। এটা তার ড্রয়িং-রুম, যেখানে সরমা বসে আছে। গদি-আঁটা সোফা, মেঝেতে গালিচা পাতা। মাঝখানে ঢাকনি-দেয়া ছোট একটা গোল-মতো টেবিল, তার উপর মিনে-করা ফুলদানিতে বাগানের ফুল, যত ফুল তার চেয়ে পাতা বেশি। এক কোণে একটা অর্গ্যান—পরিপাটি করে ঢাকনি দেয়া। যতটা না বাজনা তার বেশি আসবাব। শোভনা বোধহয় গায় আর সমর বোধহয় শোনে। শোনবার জন্যে কতটা আর শোনাবার জন্যে কতটা কে জানে। ছন্দ রেখে আরেক কোণে গ্রামোফোনও একটা আছে, তেমনি নিশ্ছিদ্র ঢাকনি দেয়া, রেকর্ড-গুলো এনামেলের খাপে রাখা। সব ফিল্মের গান, সরমা যা ভেবেছিলো। আর বই, যা ছিল সমরের কাছে বাঘের কাছে মানুষের রক্তের মতো। তা-ও কয়েকখানা আছে দেখা যাচ্ছে, ঘুরন্ত বুক-কেসে। বেশ মোটা-মোটা দেখতে, রঙচঙে মলাটের। বেশির ভাগই ভূতের, ডাকাতের আর খুনীর কীর্তিকাহিনী। একখানি ছবির, বিদেশিনী পর্দাবিহারিণীদের। একখানা গয়নার বিচিত্রিত ক্যাটালগ। দেয়ালে নানা ছাঁদের ফটো ঝুলছে, নানা জায়গা থেকে বদলি হবার আগেকার প্রহসন, চাপরাশ দেখিয়ে আর্দালি, চাপকান দেখিয়ে উকিল, আর সতরঞ্চি বিছিয়ে পায়ের তলায় আমলাবৃন্দ। বেশির ভাগ ফটোতেই সমরের গলায় ফুলের মালা। বেশ একটু সচেতন গর্বিত ভঙ্গিতে বসা, একটু কঠিন হয়ে, একটু ঘাড় উঁচিয়ে। এত দুঃখে না পড়লে সরমা একটু হাসতো। দু'-একটা ফটো আছে সমরের একলার।

একটাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের তলায় বাঘ নেই এই যা রক্ষে, আরেকটাতে লম্বা একটা পাইপ মুখে দিয়ে। চেনা যায় না, চিনলেও হেসে ওঠা সম্ভব নয়। আত্মহত্যার ধারে দাঁড়িয়ে যে একদিন কাঁপছিলো সে আজ বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে!

পাশের ঘরটা, খাবার-ঘর বললে বোঝা যাবে না, ডাইনিং-রুম। টেবিল পাতা। তাকের উপর থরে-থরে বাসন-সাজানো, কাঁচের বাসন, হাত ধোবার জন্যে বাটি পর্যন্ত। কফি খাবার ছোট-ছোট পেয়ালা। কাঁচের বদনা, কাঁচের কুঁজো। ছুরি-কাঁটা। ন্যাপকিন। সবই অল্প-বিস্তর আছে। সরমার মনে হলো আজকাল নিশ্চয়ই সমর আর ডালের বড়া ভালোবাসে না। মনে হলো, আর তার ছেলেমানসিতে নিজেই হাসলো মনে-মনে।

শোবার ঘরটা দেখতে হয়। ওটা ওপাশে। সেখানে ঢুকেই প্রথমে দেখতে পেলো দোলনায় ঘুমুচ্ছে একটি খোকা। বোঁচা-বোঁচা মুখ, ফুলো-ফুলো। ভাবলে অবাক লাগে, সবাই এরকম থাকে, পরে বদ্‌লে যায়, দেখতে-দেখতে বদ্‌লে যায়, শেষে একদিন হঠাৎ বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসে। দোলনায় একটু দোলা দিয়ে সরমা ঘুরে দাঁড়ালো। কায়দা করে ঘরের দু'-প্রান্তে দু'খানা খাট পেতেছে, বিয়ের জোড়া খাটটা ভেঙে নিয়ে। বিছানার উপরে ফুল-তোলা ঢাকা বিছানো। মাঝখানে মেঝের উপর গালিচার একটা সেতু। আর আসবাবের মধ্যে গদি-মোড়া একটা প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ার। আর যদিও বা কিছু থাকে সরমার চোখে পড়লো না, চোখ চলে গিয়েছে তার দেয়ালের দিকে। সেখানেও রাশি-রাশি ফটো, বেশির ভাগই যুগল। কোনোটা গা ঘেঁসে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কোনোটা চেয়ারের হাতলে বসে, কোনোটা বা সনাতন কাঁধে হাত রেখে। সরমার লজ্জা করতে লাগলো। এরা সব নিশ্চয়ই শ্বশুর-বাড়ির লোক, কাউকে সে চেনে না। এ মেয়ে-দুটিই বা কে! আর এই তেজী ভদ্রমহিলা।

এই সবই সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলো, এমন সময় পিছন থেকে শোভনা এসে বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই, চাকরি আপনার ঠিক হয়ে যাবে।'

'বাঁচালেন।' নিশ্বাস নিয়ে সামলালো সরমা। চাকরিটা যেন গৌণ, এমনি ভাব করে সে বললে, 'আচ্ছা, আপনার বিয়ের আগের কোনো ফটো নেই? যখন ইস্কুলে পড়তেন, স্কিপ করতেন, কিম্বা যখন আস্তে-আস্তে বড়ো হয়ে উঠছেন। নেই একটাও?'

'মার কাছে থাকলেও থাকতে পারে। কেন বলুন তো?'

'না, এমনি জিগগেস করছি।' সরমা হাসলো: 'ওঁর জানতে ইচ্ছে করে না, দেখতে ইচ্ছে করে না, কেমন ছিলেন আপনি ছোটবেলায়? কেমন করে ওঁর জন্যে তৈরি হয়ে উঠলেন আস্তে-আস্তে?'

শোভনাও হাসলো। বললে, 'তখন তো ভীষণ বোকা ছিলাম। কিচ্ছু বুঝতাম না।'

'তেমনি আপনারো কি জানতে ইচ্ছে করে না, দেখতে ইচ্ছে করে না, উনি কেমন ছিলেন ছেলেবেলায়, যখন কলেজে পড়তেন, যখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন—'

'ওঁর কোনোদিন ছেলেবেলা ছিল বলে তো বিশ্বাস হয় না।' শোভনা একটু যেন গর্বের সঙ্গে বললে, 'উনি বলেন মায়ের পেট থেকেই নাকি উনি কোট-প্যান্ট পরে হাকিম হয়ে জন্ম নিয়েছেন!'

হ্যাঁ, পাশেই বাথ-রুম, ওটায় জিনিস-পত্র, ট্রাঙ্ক-সুটকেস, ওদিকে সাজ-ঘর, ভিতরে আবার এই বারান্দা, নিচেই কিচেন-গার্ডেন, কত বড় টোম্যাটো হয়েছে দেখুন, আর ঐখানে রান্না আর বাবুর্চি-বেয়ারা। চাকরি-বাকরি ভুলে গিয়ে সমস্ত সরমা গভীর মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। জিনিস হারিয়ে গেলে লোকে যেমন দেখে।

তারপর দেখতে-দেখতে এতদূর গোপনে সে প্রবেশ করলো যে নিয়ে

বসলো সে শোভনার মাদুরের ব্যাগটা যাতে সমরের চিঠি রয়েছে জমা করা। ও-গুলো না দেখলেও সে পারতো, দেখে তার মনে হলো। মিথ্যা কথায় ভরা ছিল বলে তত নয়, কেননা স্ত্রীলোকের সম্পর্কে মিথ্যাকথাটা পুরুষের মজ্জাগত। যেটা লজ্জার সেটা হচ্ছে চিঠিগুলির আশ্চর্য স্থূলতা।

আনাচে-কানাচে প্রত্যেকটি ধূলিকণা খুঁটে সরমা দেখলো, সে কোথাও নেই, নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। চারদিক দেয়ালের মতো সাদা, চূণকাম-করা। নখের একটা আঁচড়ও কোথাও লেগে নেই।

স্নান করে' সে স্নিগ্ধ হলো। ভুরিভোজ করে সে তৃপ্ত হলো। এবং ইনটারভিয়ু থেকে ফিরে এসে সে বুঝলো চাকরিটা তার হবে না। মুক্তি।

বিকেলে সমর এসে বললে, 'বিষয়টা এখন কমিটির, মানে পরিষদের কাছে পেশ হবে। সভাটা শিগগিরই ডাকাবো। তারপর সেখানে যা শেষ নির্বাচন হবে জানাবো আপনাদের। আপনি কি আজ সন্ধের ট্রেনেই ফিরে যাবেন?'

অনুৎসুক মুখে সরমা বললে, 'হ্যাঁ। হাতে-হাতে চাকরিটা তো আর দিতে পারলেন না। থাকি কোথায়?'

কথাটা সত্যি। বলা যায় না যে গিরিশ-মুদির বাড়িটা তোমার জন্যে ভাড়া করেছি।

'তা ছাড়া দিতেই যে পারবেন তার ভরসাও বিশেষ দেখছি না।' সরমা হাসলো: 'আপনাদের সেক্রেটারি আমাকে যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন আর আমি যে রকম কড়া-কড়া উত্তর দিয়েছি তাতে চাকরির আশা করি না।'

শোভনা ঝামটা দিয়ে উঠলো স্বামীকে: 'তুমি সেক্রেটারিকে ধমকে থামিয়ে দিতে পারতে না?'

সমর হাসলো। পরে সরমার দিকে চেয়ে বললে, 'মফস্বলের

রাজনীতি ভীষণ জটিল। তবু আমি ছলে-বলে প্রাণপণ চেষ্টা করবো আপনার জন্যে।'

'ধন্যবাদ। আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দিন। মামার সঙ্গে একবারটি দেখা করে সোজা পিটটান দেব।' সরমা মৃদু হাসলো: 'চাকরি না পাই, শান্তি পেয়ে গেলাম অনেক।'

অনেক বাধা, অনেক বিবেচনা। সমর যেতে পারলো না স্টেশনে। কেবলই মনে হতো লাগলো ট্রেনটা যেন ছাড়ছে না, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও লাইনের উপর আটকে থেমে আছে।

আর, চলন্ত গাড়িতে, নিজের প্রচ্ছন্ন কামরাতে বসে সরমা ভাবছিলো, প্রেম একটা কী ভীষণ অপচয় মানুষের জীবনে! যা শিখে লোকে ভুলে যায় তার অবশেষটুকুই যেমন শিক্ষা, তেমনি যে প্রেম আভা রেখে অস্ত যায় তার অবশেষটুকুই তো জীবন! এই কি সেই জীবনের ছবি, এই কি সেই বিস্মৃতির অবশেষ? জীবনের যোগফলে সেই প্রেমের কি এতটুকু দান নেই? নূতন গৃহরচনার মাঝে সেই প্রেমের কি এতটুকুও ছায়া পড়বেনা? সমস্তটাই যান্ত্রিক, সমস্তটাই কৃত্রিম, সমস্তটাই অভ্যাস? সরমা মনে-মনে হাসলো। ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলে দেখলো একবার নিজের মুখ।

ছল আর বল কিছুই প্রয়োগ করতে সমর বাকি রাখলো না। কমিটির কয়েকজন ঘাড়-বঁ্যাকা, ঘিয়ের প্রলেপ দিলো তাদেরকে। সেক্রেটারির দল গেল হেরে।

সেদিন এমন ভাবে সমর বাড়ি ফিরলো যেন ঘোড়ায় চড়ে ফিরেছে। শোভনা উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'আমার মানটা তা হলে রাখলে। আজই লিখে দাও।'

টেলিগ্রাম করলে হয়। ততটা হয়তো ভালো দেখাবে না। সমর লিখতে বসলো চিঠি। কলম চললো না। লিখতে বসে লিখবে কিনা পঞ্চাশ টাকার একটা চাকরি দিয়েছি। দরকার কি। সেক্রেটারিই লিখবে।

তার চেয়ে গিরিশ মুদির বাড়িটাই আগে থেকে ঠিক করে রাখা উচিত। শোবার ঘরে আরেকটা জানলা ফোটাতে হবে। বাথরুমটা খুব ছোট। দূরে কাঁচা রান্নাঘর না রেখে বারান্দাই খানিকটা ঘিরে দিতে হবে। গিরিশের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে অনেক সে গবেষণা করলো এবং শোভনাকে সেখানে ডেকে এনে সন্ধ্যাবেলায় চা খেলো।

যথাসময়ে চিঠি গেল সরমার কাছে, সেক্রেটারির লেখা। কিন্তু উত্তর নেই। কেটে গেল সাতদিন। তবু উত্তর এলো না।

শোভনা বললে, 'নিশ্চয়ই অসুখ করেছে।'

'অসুখ! কোনোদিন অসুখ হয়েছে বলে তো শুনিনি।' বলেই সমর নিজেকে সামলে নিল: 'চাকরির চিঠি পেয়ে অসুখ করে সেই চাকরি খোয়ানো এই প্রথম শুনছি। দেখে তো মোটেই হেলে-পড়া রোগা-পটকা বলে মনে হয় না। কি বলো, হয়?'

'তবে হতে কতক্ষণ?'

'কিন্তু অসুখ হলে জানাতে পারতো না?'

'আমার মনে হয় কি জানো,' শোভনা উৎসাহিত হয়ে উঠলো: 'নিশ্চয়ই আর কোথাও পেয়ে গেছে।'

'পেয়ে যাওয়া মুখের কথা! কী কম্পিটিশ্যন, মানে প্রতিযোগিতা আজকাল। বস্তায়-বস্তায় বি-এ পাশ। পেলেই হলো! কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে এটা জোগাড় করা গিয়েছিলো। ওরই অদৃষ্ট মন্দ—আমার কী!' সমর সিগারেট টানছে আর ঘর থেকে বারান্দায় পায়চারি করছে।

উল বুনছে শোভনা। একটা ভুল ঘর ছাড়াতে-ছাড়াতে বললে, 'ভালো আরেকটা পেয়ে গেলে তুমি তাকে ঠেকাবে কি করে?'

'কিন্তু তার কৃতজ্ঞতা বলে কোনো জিনিস নেই?' সমর ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'ভালো পেয়ে থাকে ভদ্রতা করে জানাতে পারে না সে কথা? বুঝলে, কারু জন্যেই কিছু করতে নেই সংসারে।'

'আমার মনে হয় কি জানো,' শোভনা চোখ তুললো: 'তোমার সেক্রেটারি কিছুই তাকে লেখেনি। সব ধাপ্পা দিয়েছে। তুমি নিজেই খোঁজ নাও চিঠি দিয়ে।'

সমর বসলো গিয়ে আপিস-ঘরে। প্যাডের থেকে ছিঁড়ে নিল একটা চিঠির কাগজ। বাংলায়-ইংরিজিতে অনেক কসরৎ করে খান-পাঁচেক কাগজ ছিঁড়ে সে উঠে পড়লো। শেষকালে ইস্কুল থেকে ফাইল চেয়ে এনে ঠিকানা সংগ্রহ করে প্রিপেড টেলিগ্রাম করে দিল।

নিরুত্তর।

এরপর স্ত্রীলোক যা বলতে পারে, শোভনা তাই বললে, 'নিশ্চয়ই আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে।'

সমর বাড়ি গিয়ে থ হয়ে রইলো। গিরিশ, মিস্ত্রি আর জানলা নিয়ে বাইরে ছিল দাঁড়িয়ে, সেখানে ছুটে গিয়ে সে তীব্রভাবে ধমকে উঠলো: 'কে বলেছে তোমাকে এখানে এসে বিরক্ত করতে? তোমার বাড়ির দেয়াল তুমি ভাঙ কি মাথায় করে রাখো তার আমি কী জানি?'

তারপর গোপনে সে লোক পাঠালো সেই ঠিকানায়। সে এসে খবর দিল সরমা বলে সেখানে কেউ থাকে না।

ধীরে-ধীরে নেমে এলো যবনিকা। অনার্স-পাশ মেয়ে এসে চাকরিতে যোগ দিলে। কোথায় বাড়ি নিলো সমর খোঁজও করলো না। তার

অশ্বশকট যেখান থেকে যেখানে তাকে নিয়ে যায় তার বাইরে আর তার কৌতূহল নেই। কেবল মাঝে-মাঝে ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালে গিরিশ মুদির শূন্য বাড়িটা তার চোখে পড়ে।

এর কিছুকাল পরে খবর পেলো সদর থেকে বড়ো সাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছেন। সে উপলক্ষ্যে ছোটখাটো একটা পার্টি হচ্ছে স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে। মহকুমার খুদে সাহেবদেরো সেইখানে নিমন্ত্রণ। দু' ঘণ্টার রাস্তা হলেও সমর ভেবেছিলো যাবে না। কিন্তু খোদ সাহেবের ব্যাপার, যাবে না ভেবেও মনটা খুঁৎখুঁৎ করছিলো। দ্বিধা করবার দরকার নেই। রবিবার, পার্টির দিন, সকালবেলাই জমিদারের মোটর এসে হাজির।

সমর ব্যস্ত হয়ে বললে, 'সে কি, পার্টি তো বিকেলে। এত সকালে গিয়ে করবো কি সেখানে?'

জমিদারের লোক আভূমি বিনয়ে বললে, 'যখন আপনার সুবিধে, তখনই যাবেন—এ গাড়ি একলা আপনার জন্যে।'

প্রত্যাখ্যান করার আর কথা ওঠে না। ঘড়ি দেখে সমর রওনা হলো।

পৌঁছে দেখলো, ব্যাপারটা রোমহর্ষক। প্রকাণ্ড বাড়ি, দূর থেকে আলোয় আর আলোয় ঝলমল করছে। গাছে, ঘাসে, ফোয়ারায়, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় আলোর বুদ্বুদ। বাজছে একটা মেঘনাদ রেডিয়ো, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর কী ভিড় মোটর-গাড়ির। একটা মফস্বলি সহরকে রাতারাতি কোন ময়দানব যেন বিলেত বানিয়ে ফেলেছে। কে যে যাচ্ছে না এই পার্টিতে সেইটেই জিজ্ঞাস্য। আর শাড়ির কি তরঙ্গিমা! এসেন্সের পূতিগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

'আসুন।' গেটের ও-প্রান্ত থেকে কে তাকে বললে, 'আসতে রাত করে ফেলেছেন।'

আর কেউ নয়, সরমা। দেখে চিনতো না, কিন্তু গলা শুনে চিনলো। সেই সরমাই নির্ভুল, যদিও এত বড়ো একটা প্রহসনেও সে একটুও চোখের দিকে চেয়ে হাসলো না।

উজ্জ্বলন্ত শাড়ি পরেছে একটা সরমা। না, শাড়িই তার উজ্জ্বলন্ত দেহকে পরেছে বোঝা যাচ্ছে না। জরি দিয়ে মোড়া মোটা-করে-বাঁধা বেণীটা তার পিঠের উপর সাপের মতো ফণা তুলে-তুলে নুয়ে-নুয়ে পড়ছে। চোখে পুরু করে সুর্মা টানা, ঠোঁট দুটো রঙে তৈলাক্ত, আর হাতে-গলায় বুকে-বাহুতে অন্ধ করে দেয় এমন সব মারাত্মক গয়না। যে ছোঁবে, সেই যেন ভস্ম হয়ে যাবে। যে কাছে এসে ঘ্রাণ নেবে সেই যেন পাথর হয়ে যাবে। যে তার হাসি শুনবে সেই যেন চূর্ণ হয়ে যাবে। এত সুখ, এত বেশি সুখ!

বড়ো টেবিলের এক কোণে সমরকে সরমা বসিয়ে গেল। কিন্তু কাজ তার অনেক। এর সঙ্গে একটু হাসা, ওর সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে একটু ঠাট্টা করা, এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে গিয়ে ঝিলিক দিয়ে আসা। কখনো সাপের মতো চলা, কখনো রাজহংসের মতো। আর যখনই কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হয়, নিজেকে সে সবলে নিক্ষেপ করে, কেষ্ট-বিষ্টুদের সঙ্গে একে-একে আলাপ করিয়ে দেয়, কখনো বা, এমন কি, তার জমিদার স্বামীর সঙ্গে, আলস্যবশতই যে একটু অল্পবোধ, আলস্যবশতই যে অত্যন্ত ভদ্র। সাতেও নেই পাঁচেও নেই এমনি একটি স্থবির অকর্মণ্যতা। সব করিয়ে নিচ্ছে সরমা আর ম্যানেজার। এক কথায় একশো লোক খেটে বেড়াচ্ছে। সব চেয়ে এইটেই আশ্চর্য, এই অনড়ত্বের সংস্পর্শে এসেও সরমা মোটা না হয়ে পারলো কি করে?

সামনে স্টেজ বাঁধা। এক পশলা নাচ হয়ে গেল। এবার সুরু হবে জাদুবিদ্যা।

পাশের থেকে কে-এক ভদ্রলোক সমরকে বললে, 'নিন, কিছুই নিচ্ছেন না যে।' বলে বাড়িয়ে দিলে কেকের প্লেট।

চমকে সমর টেবিলের দিকে তাকালো। সবাই খেতে সুরু করে দিয়েছে। অভ্যাস-বশত সেও একটা-কিছু তুলে মুখে পুরলো।

আর কারু সঙ্গে দেখা না হোক, মালা-গলায় খোদ সাহেবের সঙ্গে চোখোচোখি হয়েছে, তাই যথেষ্ট। আগে চাকরি, আর্থিক উন্নতি, তার পরে অন্য সব। অন্য সব আর কি, সমর ভেবে পেলো না।

সরমাকে কতক্ষণ দেখা যায়নি। এবার অন্ধকারে সরে পড়তে হয়।

'আপনি তো কিছুই খেলেন না।' পিছন থেকে কে হঠাৎ বললে।

চেয়ে দেখলো, সরমা। এবারকার শাড়িটা অসম্ভব নীল, গায়ের গয়নাগুলো অসম্ভব রকম নতুন।

'না, খাওয়ার মধ্যে কী!' সমর নির্লিপ্তের মতো বললে, 'খাওয়ার জন্যেই তো আর আসা নয়।'

কিন্তু যাকে সে বলছে সে সেখানে নেই।

সে তখন আর-কতগুলো রঞ্জিতনখোষ্ঠা মেয়ের সঙ্গে খিলখিল করে হাসছে।

সমর পিছলে বেরিয়ে পড়লো এক ফাঁকে। যাবার আগে অভ্যাশবশতই প্লেট থেকে একটা সিগারেট কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু দুয়ারের সামনেই ধরলো তাকে সেই মোটর।

'এই যে, আপনার গাড়ি এইখানে।'

সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সমর বেরিয়ে গেল সোজা। বললে, 'না, আমি ট্রেনে ফিরবো।'

মাটি

দরজার কাছে কে-একটা লোক ঘুরঘুর করছিলো। হেডমাস্টারবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন : 'কী চাই ?'

লোকটা থতমত খেয়ে সরে যাচ্ছিলো, হেডমাস্টারবাবু তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই তাঁর ইস্কুলের ছেলে আজিজর রহমান। বললেন, 'দেখ তো লোকটা কে।'

এ সময়টা হেডমাস্টারবাবুর ভয়ের সময়। তিনবছর আগে নরোত্তমপুরে থাকতে তাঁর বাড়ি পুড়ে যায়, ঝাঁকে-ঝাঁকে বেনামী চিঠি তাঁর হাতে আসে। এ জায়গাটা ঠিক পাড়াগাঁ না হলেও বলা যায় না কার কী অভিসন্ধি। দিনে-দুপুরে হলেও গা-টা ছমছম করে ওঠা আশ্চর্য নয়।

'আমার ফাদার, স্যার।' আজিজ কুণ্ঠিতমুখে বললে।

এতটা গুরুদয়ালবাবু ভাবতে পারতেন না। যেন থমকে গেলেন।

ছেলের পরিচয়ের সুতো ধরে সাহসে ভর করে আমানত ঘরে ঢুকলো। গুরুদয়ালবাবু যেন ফাঁপরে পড়লেন, আর কোনো কারণে নয়, ছেলের সঙ্গে বাপকে কিছুতেই মেলাতে পাচ্ছেন না বলে। আজিজের পরনে ঢিলে পা-জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে ডোরা-কাটা সার্টের উপর গরম কোট, বুকটা বিস্ফারিত খোলা, সার্টের কলারটা ইস্ত্রির কড়া শাসনে ফণা তুলে আছে। আর, আমানত প্রায় বুড়ো, পরনে খাটো পুরানো লুঙ্গি, গায়ে ছিটের কোরা কুর্তা, কাঁধের উপর জ্যালজেলে একখানা দোলাই।

কেন এসেছে, গুরুদয়ালবাবুর আন্দাজ করতে দেরি হলো না। তবু, অভিভাবক যখন, বসতে দিতে হয়।

'বসুন।'

ফাঁকা চেয়ার ছিলো সামনে কিন্তু আমানত দরজার কাছে মেঝের উপরই বসে পড়লো। হাত জোড় করে বললে, 'ঐ আমার একমাত্র ছেলে। বাবু, আপনি না দয়া করলে—'

ছেলেকে কোথাও দেখা গেল না। বাপকে পৌঁছে দিয়েই সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

গুরুদয়ালবাবু বিরক্তমুখে বললেন, 'আমরা দু' সাবজেক্ট পর্যন্ত কনসিডার করেছি, কিন্তু আপনার ছেলে তিন সাবজেক্টে ফেল।'

'চাষাভুষো মানুষ, অতশত বুঝি না বাবু। শুধু কৃপা করে ছেলেটাকে আমার—'

'কৃপা করে—' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন: 'তা হলে ইস্কুলের বেঞ্চি-চেয়ারগুলোই বা কী দোষ করেছিলো? আপনার ছেলেকে এলাউ করতে হলে বেঞ্চি-চেয়ারগুলোকেও এলাউ করতে হয়।'

'ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবু।'

এই যুক্তির সামনে গুরুদয়ালবাবু ভারি অসহায় বোধ করলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

আমানত তাঁর পিছু নিলো। আগের কথাটার পুনরুক্তি করলো। লিখিত পুনরুক্তিটা বিরক্তিকর, কিন্তু কথিত পুনরুক্তিটা কেমন কাতর শোনায়।

'কী করেন আপনি?'

'আমি? গৃহস্থি করি।'

'গৃহস্থি মানে? চাষবাস?'

'তা নইলে খাবো কি করে বাবু?'

'প্রজাবিলি আছে? না, খাসে রেখে আধি দিয়েছেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে আমানত বললে, 'জমিই মোটে এখন দশ বিঘেতে দাঁড়িয়েছে। তার আবার প্রজাবিলি না আধি!'

'জমি তবে নিজেই চাষ করেন নাকি?'

'আর কে করবে বলুন। দু' চারটে পাইট কখনো খাটে, মাঝে-

মাঝে দু'চার বিঘে কখনো ফুরন দিই, নইলে সব আমিই নিজ হাতে কারকিত করি।'

চলতে-চলতে গুরুদয়ালবাবু থেমে পড়লেন। কম করে গ্রাম্য একজন গাঁতিদার বা মহাজন ভেবেছিলেন, কিন্তু একেবারে নিজের হাতে লাঙল ঠেলে—এটা যেন তাঁকে ঘা মারলো। আপাদমস্তক দেখলেন একবার আমানতকে। দেখে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না, এ একেবারে একজন খাঁটি মাটির মানুষ।

গুরুদয়ালবাবুর গলা থেকে সম্ভ্রমের সুরটুকু উবে গেল। বললেন, 'তোমার তবে এই ঘোড়ারোগ হলো কেন ?'

আমানত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

'বলি, ছেলেকে দিয়ে এই ঘোড়দৌড় খেলার সখ হলো কেন তোমার ? হাল ছাড়িয়ে কলম ধরতে দেবার কী দরকার ছিলো ?'

আভাসে মর্মার্থটা বুঝতে পেরেছে আমানত। ম্লান চোখে ঔজ্জ্বল্য আনবার চেষ্টা করে বললে, 'ও যে বড়ো হতে চায় বাবু।'

'যথেষ্ট বড়ো হয়েছে !' গুরুদয়ালবাবুর গলায় একটু শ্লেষ ফুটে উঠলো কিনা আমানত ধরতে পারলো না : 'চাষার ছেলে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে, এতেই গাঁয়ে পণ্ডিতি মিলে যাবে দেখো। নিদেন রেজেস্ট্রি-আপিসের ডিড-রাইটার তো হতে পারবে।'

'না বাবু, অত ছোটতে ও রাজি নয়।' আবার চকচক করে উঠলো আমানতের চোখ : 'ও বলে ও হাকিম হবে, মেম্বর হবে, মন্ত্রী হবে—'

'কিন্তু অত যে হবে, পড়ে না কেন ?'

'পড়বে বাবু, ঠিক পড়বে। আপনি খালি এ-যাত্রা ওকে পাশ করিয়ে দিন। আমি ওর জন্ত আলগা মাস্টার রেখে দেব।'

'তোমার যে দেখছি অনেক পয়সা।' গুরুদয়ালবাবু বাঁ চোখের কোণটা একটু কুঞ্চিত করলেন : 'মহাজনি আছে বুঝি?'

'হায়রে বরাত!' আমানতের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে, হতাশার ভঙ্গিতে।

'তবে, দশ বিঘে তো জমি, চালাও কি করে? জমা কত? খানেওলা ক'জন?'

'দশ বিঘে তো হালে বাবু, কিন্তু ছিলো আমার সত্তর বিঘে। তিন মৌজায় ছড়ানো। বেশির ভাগই তার কান্দর জমি, বিঘে প্রতি ধান হতো দশ-বারো মণ। খলেনে যখন ধান এনে তুলতাম—' আমানতের গলা ঝাপসা হয়ে এলো।

'সে সব গেল কোথায়?'

'সব এই ছেলের পিছনে। খাইখালাসী বন্ধক নিয়েছে মহাজন, খতে লিখেছে জায়সুদি। শেষকালে আসল টাকার জন্য ডিক্রিজারি করে নিলেম করে নিয়েছে। হ্যাণ্ডনোটে টিপ দিয়েছি দশ টাকা বলে, পরে শুনি আর্জি করেছে একশো টাকায়। দশের পিঠে একটা গোল্লা বসালেই নাকি একশো হয়। লেখাপড়া জানি না বলেই তো এই দশা। তাই মতলোব ছিলো ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে দলিলে-দস্তাবেজে আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। জমি-জিরাৎ সব সামলাতে পারবো।'

'দলিল পড়তে আর লাগে কী! ঢের হয়েছে তোমার ছেলের বিদ্যে।'

'আমিও তাই ওকে বলি বাবু, ঢের হয়েছে। কী হবে আর বিদ্যে নিয়ে? তুই চলে আয় আজিজ, বলি ওকে, বাপে-পোয়ে মিলে জমিতে লেগে যাই দু'জন। গোলা ভরে সোনা জমাই। আবার আমার সত্তর বিঘে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।' আমানতের দুই চোখ আবার চকচক করে উঠলো।

'ও কী বলে ?'

'রাজি হয় না বাবু।'

'তা কী করে হবে ? গায়ে যে তিন পল্লা উঠেছে। গেঞ্জির উপর সার্ট, সার্টের উপরে কোট। বড়ো যে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছ। অত সব ছাড়ে কি করে ?' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।

আমানত এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বললে, 'তাই আর ওর পাশ করা ছাড়া গতি নেই। দয়া করে দিন না ওকে বেরিয়ে যেতে।'

'এখন আর আমার হাতে নেই। তলার দিকটা সেক্রেটারিবাবুর হাতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো গে। কী উঠেছে এবার তোমার ক্ষেতে ?' ছোট্ট ভ্রূকুটি করে গুরুদয়ালবাবু কেটে পড়লেন।

পালানে কিছু ঠাকুরি-কলাই করেছিলো আমানত। ঝুড়ি করে তাই নিয়ে দেখা করতে গেল সে সেক্রেটারিবাবুর বাড়ি।

ভুজঙ্গ হালদার শুধু ইস্কুলের সেক্রেটারি নয়, যৌথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তদুপরি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিকল্পে সবাই তাঁকে অনাহারী বলে। সেই কারণে সর্বত্রই তাঁর গ্রাসটা কিছু উদ্যত।

ফেরিওয়ালা ভেবে আমানতকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ভুজঙ্গবাবু, কিন্তু তার বক্তব্য শুনে ও ঝুড়িটার ওজন আন্দাজ করে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'শেষ লিস্টি আমি কাল সকালেই টাঙিয়ে দেব। দেখি আর কে-কে আসে।'

শহর থেকে আমানতের বাড়ি প্রায় তিন ক্রোশ, দু'দুটো খাঁড়ি পেরিয়ে, মরালডাঙার গাঁয়ে। আজিজ থাকে ইস্কুলের হস্টেলে, সানকিতে করে পান্তা আর পেঁয়াজ খেয়ে নিত্যি সে পায়ে হেঁটে ইস্কুল করতে পারে না। আর তার সবে-ধন এই আজিজ। দু'দুটো জোয়ান ছেলে মরেছে জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে, রেখে গেছে কতগুলি মেয়ে, চাষার ঘরে যা অবান্তর।

ছেলের জন্যে বুড়ো বয়সে সেও নিকে করেছিলো কিন্তু নেকজানের মা কেবল রোগে ভোগে।

সকাল থেকে আমানতের মন খারাপ। আজিজ সব শুষে নিচ্ছে এই বলে নেকজানের মা তাকে সমস্ত রাত গঞ্জনা দিয়েছে। কোথায় ছিল আর কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজিজ। আমানত বলেছে : 'আর দুটো দিন সবুর করো নেকজানের মা, আজিজ আমাদের আবার সব ফিরিয়ে দেবে।' নেকজানের মা বলেছে : 'কচু! মান সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হবে সবাইকে।'

নেকজানের মার আমলেও সে কম দেখেনি। আগে দলিজঘর ছিল, খলট ছিল যেন বেড়াবার মাঠ, দু'খানা ছিল গরুর গাড়ি, সাইকেল ছিল একটা, তিন-তিনটে ছিল হ্যারিকেন। তার গায়েও দু'চার গাছা বাজু-খাড়ু উঠেছে। কিন্তু আজ সে সব কোথায়? ঘরের টিন উড়ে গিয়ে ছন এসেছে, অস্থাবর করে গাড়ি-গরু-সাইকেল ধরে নিয়ে গেছে মহাজন, খলটের জমি লেগেছে এখন খেতির কাজে। গাছ-গাছালিতে বাড়ির সীমানা ছোট হয়ে আসছে দিন-দিন।

কিন্তু আশা ছাড়েনি আমানত। বাড়ির গায়ে হালটের উপর দাঁড়িয়ে আদিগন্ত তাকিয়ে এখনো সে আন্দাজ করতে পারে কতদূর পর্যন্ত তার জমির সাবেক চৌহদ্দিটা প্রসারিত ছিল। তার ঠাকুর্দা এজারদ্দি সেখ— মুদাফৎ এজারদ্দি সেখ আজো দেখা যাবে জমিদারের চিঠা-খতিয়ানে। ভয় নেই, সব আবার আজিজ ফিরিয়ে আনবে। বিয়ে করে ছেলে এনে দেবে তাকে এক পাল—নাতিতে-ঠাকুর্দাতে মিলে তারা চৌপহর আবাদ করবে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবে ঝমঝম। মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাবে একহাঁটু। মাঠ ছেয়ে তরতাজা ধান উঠবে গজিয়ে।

ভাটিবেলায় আজিজ এসে হাজির।

'নাম টাঙিয়ে দিয়েছে বাপজান। এক লক্ষ্মণ মণ্ডলের ছেলেটা পায়নি। লক্ষ্মণ বিনাটাকায় হ্যাণ্ডনোট কাটতে রাজি হয়নি, তাই।'

আমানতের খুসি হবারই কথা, কিন্তু কেন কে জানে চোখদুটো তার চকচক করে উঠলো না। ছেলেকে কেমন যেন তার বিদেশী, বেমানান মনে হচ্ছে। যেন বড়ো বেশি এলেম, বড়ো বেশি চটক তার চেহারায়। সব কিছু কেমন বেজুত লাগে তার সামনাসামনি।

'পাশ করলে, এক হাঁড়ি রসোগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে না?' নেকজানের মা মুখ ঘুরালো।

আমানতের মনে পড়লো এমনি রসগোল্লা আনতো সে সহর থেকে যখন ভালো দর পেত সে ধানের। বলতো : 'খবর জবর ভালো নেকুর মা, সরু-এলাইর দাম চড়েছে। কিনে এনেছি এই রসোগোল্লা। আর এই এক গোছা পদ্মপাতা। সবাইকে দাও পাতায় করে।'

সে সব দিন কি আর আছে?

'চাচা এই তিলকুট দিয়েছে নানী। গুড়ের তিলকুট।'

'গুড়ের নয় বোকা।' আজিজ সংশোধন করে : 'ওটা চকোলেট। সাহেবমেমের বাচ্চারা খায়।'

তিলকুটের স্বাদ বেড়ে যায়। তারপর তার মোড়কের কাগজ নিয়ে শিশুগুলোর মধ্যে মারামারি সুরু হয়।

'এলাউ তো হলাম, কিন্তু ফি-ঠি জড়িয়ে লাগবে এখন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।' আজিজ আমানতকে মনে করিয়ে দেয়।

'টাকা?' আমানত যেন ভিতর থেকে ঝাঁকুনি খায় : 'এত টাকা মিলবে কোথায়?'

'না মিললে চলবে কি করে? শেষকালে পাড়ু এসে ভরাডুবি হবে নাকি?'

হলেও যেন ভালো ছিল। আমানতের বুকের ভিতরটা হাজাশুখা জমির মত খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

'এবার ছাড়ান দে, আজিজ। ঐ গ্যাখ ঐ নদী পর্যন্ত আমার জমির সীমানা ছিলো।' দক্ষিণে দূর জলের রেখা যেখানে আকাশের সাদায় গিয়ে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে আমানতের চোখ চকচক করে ওঠে: 'সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। আয়, দুজনে লেগে যাই লাঙল নিয়ে, সব আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসি বুকে করে।'

আজিজ হেসে ওঠে: 'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? নিশ্চয় সব আবার ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। আমাকে মানুষ হতে দাও একবার। তুমি ভাবছ কী? থাকবে নাকি আর এই আউরের ঘর? সব পাকা ইমারত হয়ে যাবে দেখো। আর তখন সব মধ্যস্বত্ব কিনবো—প্রজা বসিয়ে দেব, রায়ত আর কোলরায়ত—গায়ে মাটি মেখে লাঙল আর বাইতে হবে না তোমাকে। তখন খাজনা নেব—নগদ আর ধানকড়ারি।'

'গায়ে মাটি মাখবো না তবে বাঁচবো কি করে?'

আজিজ আবার হেসে ওঠে: 'সাবান মেখেও দিব্যি বাঁচা যায় বাপজান, ভাবনা কী?'

না, দরিয়ার পারে এনে না' ডুবানো যায় না, কিন্তু কোথায় পাবে টাকা? মহালের মহাজনরা সব খুতির মুখ দিয়েছে বন্ধ করে, একপয়সা কেউ কর্জ দেয় না। সাদা খত দূরের কথা, রেহানী খতেও টাকা ছাড়তে কেউ রাজি নয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। রেজাইখানা কাঁধে চাপিয়ে আমানত হাজীসাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

আর্জি শুনেই হাজীসাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো: 'আবার টাকা ধার করতে এসেছ কোন মুখে হে আমু মিয়া? দু' দুখানা বন্ধকী তমস্সুক—দু' বিঘে আর তিন বিঘে—বোর্ডের কারসাজিতে বেমালুম

ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে—আবার টাকা কিসের হে ? অভ্যেস এখনো শোধরালো না দেখছি ।'

'ছেলের পরীক্ষার ফিস দিতে হবে, গোটা পঞ্চাশ টাকা চাই হাজীসাহেব। খাইখালাসী নিন কটকবালা নিন—যা আপনার পছন্দ। দু'বার করে তো আর বোর্ডে যেতে পারবো না।'

'অত সব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই বাপু। সোজাসুজি সাফকবলা করতে পারো তো দেখতে পারি।'

'কতখানি চাই কত টাকায় ?' আমানত আড়ষ্টের মতো জিগগেস করলে।

'ঐ পাঁচ বিঘেই আমার চাই—যা তুমি তখন ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছ। ঐ পাঁচ বিঘে আওল জমি বিক্রি করো তো একশো টাকা দিতে পারি।'

'কিন্তু হালফিল একশো টাকার আমার দরকার নেই।' আমানত যেন নিশ্বাস ফেললো।

'টাকার আবার দরকার নেই কার ? এ যে নতুন বাত শোনাচ্ছ মিয়া। খরচ করতে না চাও দর-পরদা রেখে দাও জমিয়ে।'

'কিন্তু কান্দর জমি—বিঘে প্রতি দাম মোটে কুড়ি টাকা ?'

'ঢোল-সহরৎ করে দেখলেই পারো। না পোষায় অন্য জায়গায় পথ দেখ। আমি এক কথার গাহেক। খাতিরনাদারৎ।'

'দু' বিঘে নিন না—দু' বিঘেতে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিন। ফরমানি করুন, হাজীসাহেব।' আমানত মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

'বলি, গরজটা কার হে, আমু মিয়া ? এক লপ্তে জমি চাই পাঁচ বিঘে—সবই তোমার এক কদরের জমি নয়, কান্দরের সঙ্গে ডাঙ্গাও কিছু আছে—দাগ-খতেন আমার মুখস্ত। তোমার টাকার দরকার কম হতে

পারে কিন্তু আমার জমির দরকার কম নয়। রাজি থাকো তো কবলার মুসাবিদা করে ফেলি। পরে আধি নিতে চাও তো নিতে পারো—ফসল যখন করা হয়ে গেছে। বুঝলে, এর বেশি মহকুফ চলবে না।'

কী দমবাজ, কী ঢুঁদে—আমানত ভাবে, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারে না।

উপায় কী—কোথায় নইলে টাকা! তার আজিজ নইলে মানুষ হয় কী করে! সাত দিন পরে ফিস দেবার শেষ তারিখ, আজিজ তাগিদ পাঠিয়েছে। ঘুরঘুট অন্ধকারে আমানত দিক-বিদিক দেখতে পায় না, কবালার গায়ে কোনাকুনি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে ফেলে।

ধানের শীসে আগুনের শিস—সমস্ত মাঠ ভরে গেছে এখন সোনার আমেজে। পাঁচ বিঘে চকবন্দী করে দিয়ে গেছে হাজীসাহেবের জমানবীশ। গা-গতর ঢেলে চাষ করেও ফসলের অর্দ্ধেক শুধু তার।

'এই পঞ্চাশ টাকা তোর কাছে রেখে দে, নেকজানের মা।'

'কী, আমার পৈঁছে হবে নাকি?' নেকজানের মা ঘুরে দাঁড়ায়।

'চামালি করিস নে। মেজাজ আমার আজ রুঠা হয়ে গেছে।'

'কেন, হয়েছে কী? টাকা পেলে কি করে?'

'লুটতরাজ করে। নাউড়ে হয়ে এবার ডাকাতি করতে বেরুবো।' আমানতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

'বলো সত্যি করে, টাকা কে দিলো।'

'আর কে দেবে, নেকজানের মা? আমার এই জমি আমার এই-জায়দাদ ছাড়া আর কে ছিলো আমার? আমি একটা আহাম্মক, সব ভুট করে দিলাম।'

'কী, জমি বিক্রি করেছ বুঝি? কতখানি? এবার কি সব তবে

ভুকসানি হয়ে মারা যাবো নাকি ?' নেকজানের মা চোখে আঁচল চাপা দিল।

'ভয় নেই নেকজানের মা, আমাদের আজিজ আছে। রহমান আছেন। আবার সব ফিরে পাবো।'

ধান কেটে খলেনে ভাগ হয়ে গেল। গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল হাজীসাহেবের। আউড়ের কুটোটি পর্যন্ত সে কুড়িয়ে নিলে। আমানতের দেহে যেন আর জোর নেই, জেল্লা নেই, শিটা হয়ে আসছে দিন-দিন।

মজুদ পঞ্চাশ টাকা রাখা গেল না সরিয়ে—উড়াল দিয়ে চলে গেল। আজিজ যাবে সহরে পরীক্ষা দিতে। রাহা-খরচ আছে, খোরাকি আছে, জামা-কাপড় আছে—ফরদা সে খরচের ফর্দ। এদিকে ধূলধেকড়া সব ছেলেপিলেদের পরনে। তবু, যতটা পেরেছিলো রেখেছিলো আমানত হাতের মুঠ আঁট করে, শোনা গেল মাস্টারসাহেবের দু' মাসের পাওনা বাকি আছে কুড়ি টাকা।

'ফকির-ফোকরা হয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি শেষকালে ?' নেকজানের মা ঝামটা দিয়ে ওঠে।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। আজিজ আমাদের মসনদে বসাবে। তুই থাকিস ইমারতে, নেকজানের মা, আমি আমার ভুঁইয়ে বুক দিয়ে পড়ে থাকবো।'

আরো পাঁচ বিঘে এখনো আছে। ঝাঁ ঝাঁ করে আকাশ, মেঘের ছিটেফোঁটা নেই আনাচে কানাচে। আমানত আকাশের দিকে তাকায় আর লাঙ্গল ঠেলে। পানিপশালা এবার আর হলো না এ-তল্লাটে।

আধপেটাও বুঝি আর জোটে না। এবার বোধহয় নগদা মজুরিতে পাইট খাটতে হয়।

না, রহমান আছেন। টেনেবুনে আজিজ পাশ করেছে। চাষার ছেলে আজ তাকে আর কে বলে। বদলে গেছে তার নামনিশানা।

'কী করবি, আজিজ ?' জিজ্ঞাসা করতেও যেন সম্ভ্রম হয়।

'পড়াবার তো আর মুরোদ নেই তোমার, এবার তাই চাকরি নেব।'

চাকরি আছে গোটাকতক। আদালতের আমলা। প্রাথমিক একটা পরীক্ষা হবে লোকদেখানো। জেলার সেরেস্তাদারকে যে ভারি হাতে খাওয়াতে পারবে তারটাই অবধারিত, আর সব খারিজ।

'একশো টাকায় রফা হয়েছে, বাপজান।'

'আবার টাকা !'

কিন্তু চমকে ওঠার কিছু নেই। নৌকো শুধু পাড়ে ভিড়ালেই চলবে না, নোঙর নামাতে হবে। টাকা দেবার জন্যে জমি রয়েছে এখনো নিটুট পাঁচ বিঘে।

দোয়াত-কলম স্ট্যাম্প-ইসাদি নিয়ে হাজীসাহেব এসে হাজির। পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চাগে—বাকি পাঁচ বিঘেও লোপাট হয়ে গেল।

সদর থেকে আজিজ চাকরির খবর নিয়ে এলেও আমানতের কান্না থামলো না : 'একেবারে ফৌত-ফেরার হয়ে গেলাম, নেকজানের মা।'

বাপ-পিতামোর ভিটেটুকুই শুধু আছে। কিন্তু কী হবে তার এই বাস্তু দিয়ে যদি আর তাতে বস্তু না থাকে এক কণা !

আজিজ সবাইকে সহরে নিয়ে এলো, তার কর্মস্থলে। ত্রিশ টাকা মাইনেতে টায়েটুয়ে সে চালিয়ে নেবে সংসার। এদিক-ওদিক আছে কিছু উপরি—ঘাঁতঘোঁত সে এরি মধ্যে দোরস্ত করে নিয়েছে। এলেমদার ছেলে সে—কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ছিলিম খেয়েও আমানত আর আগের স্বাদ পায় না, শ্রান্তদেহে

তামাকের সে-ধার। দু দিনেই তার গতুরে শরীর কেমন ধসকে গেছে, বাত জমে উঠেছে গাঁটে-গাঁটে। মেজছেলের বৌটা আলাদা হয়ে গেছে, বড়োছেলের বৌটাও যাব-যাব করছে। নেকজানের মা রয়েছে এখনো তাকে আঁকড়ে। কিন্তু একেক সময় ইচ্ছে করে আমানতের, তাকে তিন-তালাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আবার তার মাটির আকর্ষণে—কাঁচা-সোনা-গা নয়লী যৌবনী কাউকে সাদি করে ফের বুড়ো বয়সে, এক ফৌজ সৃষ্টি করে সে মাটির উপর, দিগন্ত পর্যন্ত সে সবুজের তরঙ্গ তুলে দেয়।

তার দিন আর কাটে না। অনড় হয়ে আসে তার হাত-পা। খাবার পর ঢেঁকুর ওঠে। তাই আজিজ তাকে বাজারে একটা খোপরি ভাড়া করে দিয়েছে। আমানত সেখানে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে সেলাইর কল চালায়। ফতুয়া বানায়, কুর্তা বানায়, সার্ট বানায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যবসা। আমানত আর চাষা নয়, খলিফা। আজিজ আর চাষার ছেলে নয়, খলিফার ছেলে। অনেক নরম লাগে শুনতে।

কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌ করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়—বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ ; আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।

চূড়ান্ত

একে একে বহু লোকের সঙ্গে পরিচিতীকৃত হলুম, কিন্তু সব চেয়ে দু'জন আমাকে বেশি আকর্ষণ করলো। এক দাদা, আরেক ব্যারিস্টার।

দাদার নাম দুঃখহরণ গুহ নিয়োগী, নিবাস বীরশ্রী ওরফে বিরিছিরি, ব্যবসায় সর্বজ্ঞ। আর ব্যারিস্টার-সাহেবের নাম-ধাম যাই হোক, এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, সে আসলে ওকালতি করে।

তার এই নামকরণের অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, সে নাকি মনে করে তার ঠিক ব্যারিস্টারের মতো চেহারা, দ্বিতীয়ত, সে নাকি বম্বে থেকে ঘুরে এসেছে, তৃতীয়ত, সে নাকি য়্যাকসেণ্ট দিয়ে ইংরিজিতে সওয়াল-জবাব করে, আর চতুর্থত, এইটেই প্রাণান্তকর—ব্যারিস্টার কথাটা সে উচ্চারণ করে বেরিস্টার বলে। সেদিন যখন সে আমাকে বললে, এখানে টেক্সি পাওয়া যায়, আমি তখন ভেবেছিলুম, এর নাম ট্যাক্সি রাখা হলো না কেন ?

দাদাকে সত্যিই পেয়েছি দুঃখহরণরূপে। সোনার হৃদয় নিয়ে এমন মাটির মানুষ দেখিনি সংসারে। শীর্ণকায়, ছোটখাট দেখতে, মাথায় সুশীতল একটি টাক, মুখে চিরলিপ্ত একটি প্রসন্নতা। যেমন নিজে হাসেন তেমনি অন্যকে হাসান। সরল, সদাশিব, আত্মভোলা।

আর ব্যারিস্টারকে পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে। কখন কোন পূর্বাধিকারী একে দলে সংগ্রহ করেছিলো, সেই থেকে ক্রমান্বিতভাবে এক বংশ থেকে আরেক বংশে হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে। আমার পরে আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন আবার এই ব্যারিস্টারকে।

বৈকালিক আড্ডাটা আমার বৈঠকখানাতেই বসতো। তার চতুর্বিধ কারণ ছিল। প্রথমত, আমি অবিবাহিত, দ্বিতীয়ত, আমার বাড়িটার মধ্যস্থতা, তৃতীয়ত, সোফা-সেটির বদলে ঢালা ফরাস, আর চতুর্থত, ঢালাও

তাম্রকূট। আর কেউ আসতো বা না আসতো দাদা ও ব্যারিস্টারের কোনোদিন কামাই হতো না।

আমার বাড়িতে প্রথম আড্ডাটা সেদিন বিরাটভাবে জমেছে, আর আমি প্রত্যেকের এককেন্দ্রিকতাগুলি লক্ষ্য ও উপভোগ করছি।

আমাকে শোনাবার জন্যে প্রচলিত পুরোনো গল্পগুলিরই পুনরায় অবতারণা হচ্ছে।

'দাদা, আপনার ছোট ছেলেটির বয়েস কত?' দলের মধ্যে থেকে মুখফোঁড় ষড়াননবাবু জিগগেস করলেন।

দাদা হাসতে হাসতে বললেন : 'কেন, কতবার করে শুনতে হবে?'

আমাকে লক্ষ্য করে ষড়াননবাবু বললেন : 'ত্রিলোচনবাবু শোনেন নি।'

আমার দিকে চেয়ে ততোধিক হাসতে হাসতে দাদা বললেন : 'ছ' মাস।' বলেই দাদা ত্বরান্বিতভাবে যোগ করে দিলেন : 'ভুল বুঝো না ভায়া, ছ'মাস ভূমিষ্ঠ।'

রাধাবল্লভবাবু জিগগেস করলেন : 'এটি আপনার কত-তম?'

'চতুর্দশতম।'

'কোন পক্ষীয়?'

'শত্রুপক্ষীয়।' দাদা উচ্চহাস্য করে উঠলেন। বললেন : 'বোসো ভায়া বোসো। সবাই শুনেছে, তুমি আর বাকি থাক কেন? মানে হয়েছে কিনা, আমার দ্বিতীয় বার পদস্খলন হয়েছে। তোমার প্রথম বৌদিদি মারা যাবার পর মতিচ্ছন্ন হয়ে পুনর্বার দার পরিগ্রহ করেছিলুম। তিনি ছ'টি সন্তানের জননী ছিলেন, ছোটটি বছর খানেকের। তোমার দ্বিতীয় বৌদিদিকে ঘরে এনে বললুম : 'তুমি এদের সবারই মা হলে, কেমন?' তিনি দেখলুম তাতে মোটেই সম্মত নন, বললেন : 'ককথনো না। ও তোমার একার সন্তান, একতরফা, ও-সবের আমি সরিক নই।'

তারপর ষোল আনা স্বত্ববতী হয়ে এই ষোল বছরে একাদিক্রমে তিনি আটটি সন্তান প্রসব করেছেন।'

'কথাটা তেমন আজ জমাটি করে বলতে পারলেন না, দাদা।' বললেন যোগজীবনবাবু।

'আরে ভায়া, বুঝতে পেরেছ তো? তা হলেই হলো। এক কথায় দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার আর কি।'

'কথাটা ঠিক হলো না, দাদা।' বললেন ষড়াননবাবু।

'কৃতিত্ব যদি কিছু দিতে চাও তো নিতে পারি।' দাদা অমায়িকভাবে বললেন: 'আর যাই হোক কয়েক দশমিক পার্সেণ্টেজ বাড়াতে পারাটাও তো কম নয়।'

'তার পর দরকার হলে আবার তৃতীয় পক্ষ করবেন তো?' একটু রাগত গলায় প্রশ্ন করলেন ব্যারিস্টার।

এত বড় একটা কঠিন প্রশ্নেও দাদা বিচলিত হলেন না। বললেন: 'পিত্তিরক্ষার জন্যে করতেও হতে পারে। জানো তো, বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে।' বলে দাদা বিকশিত দন্তে হাসতে লাগলেন।

ব্যারিস্টার আমার কানের কাছে মুখ এনে গম্ভীর নিম্নকণ্ঠে বললে: 'নিজের স্ত্রী নিয়ে কী অন্যায় রসিকতা দেখুন। অসহ্য।' বলে আমার সন্নিহিত হবার চেষ্টায় পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের একটি অপচীয়মান টিন বের করে আমার হাতে একটি সিগারেট দিয়ে বললে: 'আমার স্ত্রী বলেন আমার নাকি সিগারেটেই মাসে বত্রিশ টাকা খরচ হয়। ফ্রাইটফুল। আপনার?'

লজ্জিত বিনয়ে বললুম: 'কি করে বলব, এখনো আমি অস্ত্রীক।'

কিছু একটা রসিকতা করেছি মনে করে ব্যারিস্টার ঘাড় ঝাঁকাতে-

ঝাঁকাতে প্রতীচ্য পদ্ধতিতে হাসতে লাগলো এবং লক্ষ্য করলুম সিগারেট আর একটাও বিতরিত হলো না। মনে হলো, আমি যে কাঁচি খাই এ যেন তারই উপর একটা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি।

ওদিকে রাধাবল্লভবাবু দাদাকে আবার অতীতস্মর করে তুলেছেন।

'দাদা, কোর্টে গাড়ি চড়ে যান না কেন?'

'কতবার শুনবে বলো দেখি?'

'ত্রিলোচনবাবু তো শোনেননি। তা ছাড়া, ও সব গল্প কি কখনো পুরোনো হয়?'

'সেই আমার দুই নম্বরের অনুশাসন।'

'সে কি কথা, তা তো বলেননি এত দিন।' যোগজীবনবাবু আপত্তি করলেন: 'বলেছেন যে রাস্তার পাশে মহেশ উকিল মক্কেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর আপনার গাড়ি আসতে দেখে মক্কেলকে বলে: 'এই ত্যাখ আমার সঙ্গে কত খাতির, এক লাফে গাড়ির মধ্যে কেমন চেপে বসবো।' বলে আপনার গাড়ি থামিয়ে আপনার পাশে বসে চেঁচিয়ে মক্কেলকে বলে: 'কেমন, দেখলি?' এ শাস্তি এড়াবার জন্যেই তো আপনি গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন শুনেছি।'

'আরে ভায়া, ছ'মাস আগে তাই ছিলো, কিন্তু গাড়ি ছেড়েছি চতুর্দশতমটির আবির্ভাবের পর থেকে। গিন্নি বলে দিয়েছেন পোস্টাপিসে পাশ-বই খুলে গাড়ির ঐ দশ টাকা প্রতি মাসে খোকার জন্যে জমাতে হবে।'

'তারপর যখন পঞ্চদশতমটির আবির্ভাব হবে, তখন?' ষড়াননবাবু টিপ্পনি কাটলেন।

'তখন—তখন হয়তো সেই গামছা-চুরি-যাওয়া লোকটার মতো দাড়ি রাখবো।' বলেই দাদা অনর্গল হেসে উঠলেন।

ট্রে-তে করে বাটি সাজিয়ে চাকর চা নিয়ে এলো।

দাদা বললেন : 'আমি উঠি।'

'সে কি কথা, একটু চা খেয়ে যান।' বললুম মিনতি করে।

'এদেরকে জিগগেস করে দেখ, চা আমি খাই না। কাকে কখন কী তার কারণ বলে থাকবো মনে নেই, আসল কারণ হচ্ছে এই, খেলেই খাওয়াবার একটা দায় ঘটে। মানে, তুমি আজ খাইয়ে কাল আশা করবে আমি তোমাকে খাওয়াবো। তোমার বৌদিদি সেটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। তাই স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন যেন কোথাও জলটুকুও না ছুঁই।

বললুম : 'তাতে কি, নাই বা খেতে দিলেন আপনি—'

'আরে ভায়া, তা কি হয়? এই কথাটুকু বলতেই তোমার গলায় কেমন একটু অভিমান বেজে উঠলো। খাঁটি কথা কি জানো? চা-টা এখন খেলেই দু' গ্রাস কম খেতে হবে, তার পরিপূরক হিসেবে এতটা গালাগাল খেতে হবে যে, হজম করতে পারবো না।'

'হজম না করেই বা আপনার সাধ্য কি?' রাধাবল্লভবাবু গলায় একটু ঝাল মেশালেন।

'আরে ভায়া, সেই জন্যেই তো এই কবচটা সম্প্রতি ধারণ করেছি।' বলে দাদা তাঁর জামার ভিতর থেকে লাল সুতোয় বাঁধা তামার কবচ বের করে দেখালেন। বললেন, 'এর নিষেধই হচ্ছে পরান্ন গ্রহণ করা।'

'তবু ভালো।' ষড়াননবাবু ফোড়ন দিলেন, 'তৈলমাংসাদি যে নিষিদ্ধ হয়নি।'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললুম : 'চা তো আর অন্ন নয়।'

'আরে ভায়া, স্যুট যেমন আপিলের অন্তর্ভুক্ত, গৃহ যেমন গৃহিণীর অন্তর্ভুক্ত, চা-ও তেমনি অন্নেরই সামিল।'

'এ কবচের নাম কী?' ষড়াননবাবু জিগগেস করলেন।

প্রথম পক্ষের বড়ো মেয়ে লক্ষ্মী থাকে তার মামার বাড়িতে, কাঁটাপুকুরে। মেয়েটাকে একবার দেখে আসবার ইচ্ছে ছিলো, গিন্নি বলে দিয়েছেন : 'ট্রাম-ভাড়া পাবে না, মিড-ডে ফেয়ারও নয়।' এই লক্ষ্মীর সঙ্গেই গিন্নির এতটুকু বনিবনা নেই, চক্ষের কোণে দেখতে পারে না মেয়েটাকে। আরে ভায়া, ট্রাম-ভাড়া দেবে না, কিন্তু পায়ের দড়ি তো এখনো ছিঁড়ে পড়ে নি। হেঁটে মেরে দিতে পারবো না? নইলে, কোলকাতা যাব অথচ লক্ষ্মীকে দেখে আসবো না এ কখনো সম্ভব?' বলে কথার সুরের সঙ্গে পারম্পর্য রক্ষিত হলো কিনা বিবেচনা না করেই দাদা অনর্গল হেসে উঠলেন।

'তারই রিহার্সাল দিতে বুঝি এমনি জোর-কদমে হাঁটছিলেন?'

'আরে, না ভায়া, এ হাঁটার কদমও গিন্নির হুকুমে। ম্যাদামারার মতো হাঁটি, একদম বুড়ো হয়ে গেছি, প্রতিমুহূর্তে গিন্নি গঞ্জনা করতেন। শেষে একদিন ফতোয়া জারি করলেন যে, বুক চিতিয়ে মিলিটারি কায়দায় না হাঁটি তো ঘরের মধ্যে তিনি আমাকে তালাবন্ধ করে রাখবেন। উল্টো প্রতিশোধ, একেবারে রংফুল কনফাইনমেণ্ট!' বিহ্বল গলায় দাদা হেসে উঠলেন : 'এমনিতে সুন্দরী ভীষণ পর্দানসিন, কিন্তু আমি যখন কোথাও বেরুবো, ঠিক জানলা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, হাঁটায় ঠিক আমার মহিষমর্দন ভঙ্গিটা ফুটে উঠছে কিনা।' বলে আরেক পশলা হাসি।

এমনি একটা হাসির গল্প শুনছি, নির্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততায় আমিও হাসলুম।

স্টেশনে এসে দেখি অনেকেই যাচ্ছে। লম্বা একটা ইণ্টার ক্লাস কামরাতে তুমুল গুলতানি চলেছে।

ব্যারিস্টার উৎফুল্ল হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো : 'আপনিও যাচ্ছেন নাকি কেলকাটা?'

বললুম : 'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি যেতে পারি রাত্রির গাড়িতে। আমার স্ত্রী বললেন নাইট-জার্নিটাই বেশি কম্ফার্টেবল্। নিন একটা সিগারেট।' বলে সদ্য-ক্রীত গোল্ডফ্লেকের টিনটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

দেখলুম আমার প্রতি আজ আর তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই, কেন না সবাইকে এই একই সিগারেট ইতিপূর্ব্বে বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যারিস্টার আমার মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে দিতে জিগগেস করলে : 'কেলকাটায় থাকবেন কোথায় ?'

থাকবো কালীঘাট, কিন্তু বললুম : 'হেরিসন রোড।'

এ ট্রেনে যাবে না অথচ স্টেশনে এখন এসেছে কেন ব্যারিস্টার সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা আমাকে নাড়া দিচ্ছিলো। পূর্বাভিজ্ঞ দাদাদেরকে জিগগেস করে জানলুম, কোনো ট্রেনেই নাকি সে যায় না অথচ যে কোনো ট্রেনে যে কোনো অফিসারই যখন যায় তাকে সে নির্ঘাৎ 'সী-অফ' করতে আসে, আর ভিড় বুঝে প্যাকেট বা টিন কিনে মুক্তহস্তে সিগারেট বিলোয়। এটা নাকি তার একটা প্রথার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। আরেকটু অপেক্ষা করো, গাড়িটা ছাড়ুক, দেখবে বকের পাখার মতো বিলিতি কায়দায় সে রুমাল নাড়বে।

এ জায়গার সঙ্গে সে যে ভীষণ বেমানান এমনি একটা কুঞ্চিত বিরক্তি তার নাসিকাগ্রে লিপিবদ্ধ ছিল। আমরা যখন পরিহাসচ্ছলে এ-জায়গার নিন্দা করতুম তখন অবিমিশ্রভাবে দলে পেতুম ব্যারিস্টারকে। সে ছাড়া আর সবাই যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন সেটা সে অতি সহজেই প্রতিপন্ন করতো শুধু এই ইঙ্গিত করে যে, তার মতো আর কেউই আমাদের সঙ্গে মেশে না বা মেশবার উপযুক্ত নয়। কালচারের 'ক' জানে না কেউ—সে-ই প্রথম এখানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আরম্ভ করে। তার স্ত্রী বোলপুরের মেয়ে, জয়ন্তী হয় না শুনে তো তড়িতাহত। বলেন : 'এ-দেশটা কি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসেরো বাইরে নাকি ?'

এর পর আমার জন্যে একটি পাত্রী নির্বাচনের কথা উঠেছিলো। আমি বললুম: 'যদি বিয়ে করি তো, হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামের একটি মেয়ে বিয়ে করবো।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো: 'কেন, কেন?'

'নইলে শরৎ-বন্দনা কে করবে?'

বস্তুত স্ত্রীর একটু অভাব বোধ করছিলুম সম্প্রতি। নতুবা দাদার ও ব্যারিস্টারের স্ত্রীদ্বয়ের রহস্যভেদ আর কে করতে পারবে?

সহোদর দাদা ও খুড়তুতো দাদাদের কারুর কাছ থেকেই কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তার কারণ দুঃখহরণবাবুর স্ত্রী এখানে পরে এসেছেন এবং এ-পর্যন্ত কারু বাড়ি পদার্পণ করেননি বলে মেজ-সেজ-ন' বৌদিদিরাও কেউ যাননি তাঁর বাড়িতে। আর, বোলপুর বা ঢোলপুরের মেয়ে হোক, কোনো উকিলের স্ত্রীর কাছে আগাম যাওয়াটা এদের পক্ষে ঘোরতর বিধর্মিতা।

আগের দিন আড্ডায় দাদা আসেন নি বলে পরের দিন আড্ডা বসবার আগেই তাঁর সন্ধানে বেরুলুম। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু রোয়াক, বৃষ্টি না থাকলে ওটাই দাদার বৈঠকখানা।

চাকরের মতন দেখলুম কাকে দরজার কাছে। পাছে দাদা বললে ঠিক না চিনতে পারে, বললুম: 'এই, দুঃখবাবু বাড়ি আছেন?'

'দুঃখবাবু নয় হে ভায়া, দুঃখীবাবু।' বলতে বলতে দাদা হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন বাইরে। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়ানো, বুকের উপর সভালব্ধ সেই শিশু। তাঁর মুখের চেহারা দেখে কেমন খটকা লাগলো, মনে হলো হাসিটা তাঁর অভ্যাসের হাসি, অনায়াস হাসি নয়।

বললুম, 'বেরোননি যে?'

'শরীরটা ভালো নেই। বোধহয় জ্বর হয়েছে।'

'শরীর খারাপ হয়েছে তো খালি গায় বাইরে এসেছেন কেন ?'

'আরে ভায়া আমার শরীর নয়, শ্রীশরীর।' দাদা হাসতে গেলেন, কিন্তু পরের কথাগুলিতে সে উদ্যত আভা অন্তর্ধান করলো। বললেন : 'গৃহিণী বিছানা নিয়েছেন, তাঁর শাসনে বর্তমানে একটা শুধু চাকর—কোন দিক যে সামলাই তার ঠিক নেই। ঘর-দোর গুছিয়ে বিছানা-পত্র পেতে এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে বসেছি। বুঝতেই পারো, নিরুপায়, তাই রবার দিয়েছি চুষতে।' পরে হাসি থামিয়ে নিষ্প্রভ মুখে বললেন : 'কিন্তু যাই বলো, একদিন ঠিক বিদ্রোহ করবো।'

'কী উপায়ে ?'

'সেইটেই ঠিক এখনো মাথায় আসছে না। আমাকে অত উনি তরুণ বানাচ্ছেন, ইচ্ছে করছে তৃতীয় পাণিগ্রহণ করে ওর জাঁকটা একবার ভেঙে দিই।' এইবার তাঁর হাসিতে সেই পুরোনো সারল্যের কিঞ্চিৎ আভাস পেলুম।

ভাবলুম এই সব অতিশয়োক্তি কি সত্যিই বিশ্বসনীয় ?

এর কিছু দিন পরে শুনলুম, দাদা হঠাৎ এজলাসে ভির্মি খেয়েছেন। ছুটে গেলুম সবাই। বিশেষ কিছু নয়, সামলে নিয়েছেন চটপট। পায়ের নিচে ক্ষুদ্র একটি ভূমিকম্প টের পেয়েছিলেন আর চোখে দেখেছিলেন হরিদ্রাভ ক'টা তারার ফুলকি। কঠিন বসুন্ধরা তাঁকে প্রত্যাহার করেছে। দাদার সে কী বর্ণনোচ্ছ্বাস।

তবু সেদিন তাঁকে আর কাজ করতে দেয়া হলো না। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকাতে চেয়েছিলুম, দাদা বললেন রিকসা আনাতে। জনান্তিকে আমাকে বললেন : 'চার গণ্ডা পয়সা প্রায় বেঁচে যাবে।'

ধমক দিয়ে উঠলুম। দাদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আরে ভায়া, কিচ্ছু হয়নি আমার, দিব্যি হেঁটে যেতে পারি ইচ্ছে করলে। চেহারা দেখলে লোকে

বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, আমার অসুখ! ভাববে গাড়ি চড়াটাই ব্যারাম হয়েছে। একে ভুগছেন কোমরের বাতে, গাড়ি দেখে সর্বাঙ্গই তাঁর অসাড় হয়ে যাক আর কি। ও দুর্বুদ্ধি দিয়োনা ভায়া, দু'আনা দিয়ে একটি রিকসা ডেকে দাও, একদিন উপোস করে থেকে সহজেই হিসেব মিলিয়ে দিতে পারবো।'

ডেকে দিলুম রিকসা, কিন্তু সবাইর সঙ্গে সেদিন প্রথম সম্মত হলুম যে, দাদার ঐ ভণিতাটা তাঁর বদ্ধমূল কৃপণতার বর্বর ছদ্মবেশ।

তবু বিকেলে গেলুম তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ করতে। তাঁর বৈঠকখানায় অর্থাৎ বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো।

'পত্রপাঠ ছুটি নিন, দাদা।' যড়াননবাবু বললেন।

দাদা হাসলেন, অত্যন্ত ম্লান হাসি। বললেন: 'ক্যাজুয়েল লিভ আর পাওনা নেই।'

'কেজুয়েল লিভ-এ আর চলবে না।' ব্যারিস্টারও টিপ্পনি কাটলো, 'লম্বা প্রিভিলেজ লিভ নিয়ে চেঞ্জে চলে যান কোথাও।'

'হ্যা, ওয়ার্নিং-বেল পড়ে গেছে, আর দেরি করবেন না।' বললেন রাধাবল্লভবাবু।

আমাকে নবাগত বা অনভিজ্ঞ বিবেচনা করে ব্যারিস্টার হঠাৎ আমাকে একটা উপদেশ দিয়ে বসলেন: 'ন'টার পর ককখনো রাত জাগবেন না। মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে যদি কোনোদিন তন্ময় হয়ে পড়ি, ঠিক আমার স্ত্রী এসে আলগোছে টেবল-ল্যাম্পের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে যান। তিনি বলেন: 'রাত্রে তেল পোড়ানো আর শরীর পোড়ানো এক কথা।'

কিন্তু ব্যারিস্টার-পত্নী কী বলেন তার চেয়ে দাদার গৃহিণীর উক্তিটাই বেশি শ্রুতিরুচিকর।

'ছুটি নেয়ায় তোমাদের বৌদিদির মোটেই মত নেই। ছুটি নিলে মাইনেটা খানিক কমে যায় আর চেঞ্জে চিকিৎসায় অনাবশ্যক খরচ যায় বেড়ে, তাইতেই তাঁর আপত্তি। দু'টো পয়সা উপরি-পাওনা নেই, মাঝের থেকে ন্যায্য মাইনেতে কিনা টান পড়বে। যাদের টেনে-বুনে চলে তাদের অত বাবুয়ানা মানায় না।'

এমন কথাও কেউ শুনেছে? আমরা পরস্পরের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। রহস্য তেমনি দুষ্প্রবেশ্য হয়ে রইলো। তবু বললুম সাহস করে, 'স্ত্রী অবুঝ বলে কি আপনি অকালে মারা পড়বেন নাকি?'

'না হে না, তেমন কোনো অসুখ নয়। গিন্নি বলেছে মালবিকাগ্নিমিত্র তেল মাখলেই নাকি সেরে যাবে।'

'কী তেল?'

'ঐ একটা কি নাম বললে কটমট। তার মামার নাকি সেরে গেছে।'

'আপনি যখন মামা নন তখন ও তেলে কিচ্ছু হবে না আপনার।' বিরক্ত মুখে বললেন ষড়াননবাবু।

দাদা অবিশ্রান্ত হাসতে লাগলেন। বললেন: 'আমার স্রেফ মর্নিং ওয়াকেই সেরে যাবে।' বলে কি ভেবে আমার কাঁধ ধরে হঠাৎ তিনি ক'টা দুর্বল ঝাঁকুনি দিলেন।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বুঝলুম যে ঝাঁকুনির অর্থ কী। অর্থ হচ্ছে এই আমাকেও তাঁর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরুতে হবে।

একদিন ফিরছি বেড়িয়ে, দেখি ব্যারিস্টারের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড ভিড় আর গোলমাল। ব্যারিস্টারের বাড়ি না বলে দিলেও চিনতে পারবেন। কেন না, বাড়ির সামনেকার জমিতে একটুখানি ফুলের বাগান আর বেড়ার গায়ে কাঠের ফ্রেমে বাড়ির যে জানালা তাতে ফুল-তোলা ছিটের পাতলা পরদা ঝুলছে।

হয় বাড়িতে চুরি হয়েছে শেষরাত্রে, নয় তো কারুর ঘোরতর অসুখ, বললুম দাদাকে। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম একেবারে উলটো। জানলুম, স্ত্রীর উপর আজ প্রত্যূষের প্রহারটাতে ব্যারিস্টার প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কান দুটোকে তীক্ষ্ণ করে যেন শুনতে পেলুম, একটা ক্ষীণ মেয়েলি কণ্ঠের কান্না আর একটা আস্ফালয়মান পুরুষের প্রবল সিংহধ্বনি। বলবো কি, বিস্ময়ে পাংশু হয়ে গেলুম একেবারে।

দাদা দিব্যি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন: 'দীনবন্ধু!'

'সে কি দাদা?'

'ঈশ্বরকে স্মরণ করলুম ভায়া, যে, এমন পুরুষও তিনি সৃষ্টি করেছেন যে ঠিকমতো প্রতিশোধ নিতে পারে। আহা, দেখে ভারি তৃপ্তি পেলুম, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।'

'কী বলছেন আপনি? অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবে আপনি সেটা সমর্থন করেন?'

'আরে ভায়া, স্ত্রী চ্যাঁচাতে পারে বলে জগৎসংসারে স্বামীর অত্যাচারটাই বিঘোষিত হয়, তার দুয়ার পর্যন্ত সিভ্যালরি আর সহানুভূতি ভিড় জমিয়ে তোলে। আর পুরুষ বেচারা কাঁদতে পারে না বলেই ঘরে-ঘরে সমস্ত স্ত্রী দেবী, মহীয়সী।'

তবু ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। বললুম: 'যাই একবার ভেতরে। ব্যারিস্টারকে ডাকি।'

দাদা আমার হাত ধরে ফেলে বাধা দিলেন। বললেন: 'মিছিমিছি ওকে আর কষ্ট দিয়ো না।'

'কষ্ট?'

'হ্যাঁ, পাশবিক রাগ থেকে হঠাৎ এক্সপ্রেশন বদলে অপর্যাপ্ত খুসি হওয়ার খোসামুদে ভঙ্গি করাটা খুবই কষ্টকর। এরকম ভঙ্গি বদলাতে

নার্ভের উপর কী ভীষণ স্টে্‌ইন হয়, ভুক্তভোগী আমি, মর্মে-মর্মে জানি। সাধে কি আর বলেছে, দি ওয়ার্‌ল্ড ইজ এ স্টেজ!' দাদা আমার হাত ধরে টানতে টানতে এগুতে লাগলেন।

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা, কাজ থেকে উঠবো-উঠবো করছি, শুনতে পেলুম গলির মোড় থেকে কে একটা লোক আপন মনে বকতে-বকতে এগিয়ে আসছে। নতুন কোনো পাগল আমদানি হয়েছে হয়তো। কিন্তু আমার জানলার কাছে আসতেই চিনলুম, কবিরাজ-মশাই।

আমাকে দেখে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি আরো বেড়ে গেল। বললুম: 'ব্যাপার কী?'

'আর মশাই ব্যাপার! এমন কথা আপনার কখনো শ্রুতিগোচর হয়েছে,' কবিরাজ-মশাই রাস্তা থেকে ঘরে উঠে এলেন: 'যে, ঔষধের সঙ্গে অনুপানের ব্যবস্থা করতে পারবো না? শুদ্ধ পুরুষে কী করবে যদি প্রকৃতি না সহায় থাকে, তেমনি একাকী ঔষধে কি কোনো ক্রিয়া হতে পারে যদি অনুপান না অন্তরঙ্গ হয়?'

'বাঙলা করে বলুন, ব্যাপারটা একটু বুঝি।'

কবিরাজ-মশাই যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, দাদার চিকিৎসার্থে তাঁকে ডাকা হয়েছিলো, কিন্তু তাঁর অনুপানের ব্যবস্থাটা একটু বিস্তৃত বলে বৌদিদি ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন, প্রথমত সে সব পত্র-মূল মূল্য ছাড়া সংগ্রহ করা যায় না এবং সামান্য কতগুলি লতা-পাতার জন্যে অর্থব্যয় করতে তিনি মোটেই সম্মত নন। দ্বিতীয়ত সে-সবের প্রস্তুতিতে এত শ্রম ও আয়াস দরকার যে, বৌদিদি তাতে সর্ব্বাঙ্গীন পরাঙ্মুখ।

'একবার বুঝুন অবস্থাটা।' কবিরাজ-মশাই বিস্ময়াহতের মতো বললেন: 'তুচ্ছ ক'টা শিকড়-পাকড়ের পিছে সামান্য দু'চার পয়সা খরচ করতে যার হাত ওঠে না নিজের সোয়ামীকে সে বাঁচাবে কী করে?'

বললুম : ‘ওসব আপনার দুঃখী বাবুর মুখে শোনা কথা তো ? সব—সব ওঁর চালাকি। নিজের কৃপণতাটা স্ত্রীর বেনামে চালিয়ে দিয়ে লোকের সহানুভূতি কুড়োনো। ওসব আপনি ককখনো বিশ্বাস করবেন না।’

‘কী বলেন, বিশ্বাস করবো না ? স্বয়ং দুঃখিনী বাব্বীর সঙ্গেই যে আমার কথা হলো।’ কবিরাজ-মশাই দুর্বাসার মতো ভঙ্গি করে দাঁড়ালেন : ‘ঠিক একটা বিয়ন্ত বাঘিনীর মতো গরজাতে লাগলো, কী জাঁহাবাজ মেয়ে ! বললে : বাজারে পটল নেই, তার এখন পাতা পাবো কোথায় ? তার চেয়ে বরং কচু পাতার অনুপান দিন।’

মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। মনে হলো কবিরাজ-মশাই হয়তো বা দাদার প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট।

এর পরে ব্যাপার আর বেশি দূর গড়ালো না। দ্বিতীয়বার যে দাদা ভিরমি খেলেন, একেবারে পড়লেন মুখ থুবড়ে আর উঠলেন না। ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আশ্চর্য, আমাদেরো জন্যে আজ আর কোনো শাসন-ত্রাসন টের পেলুম না। রোয়াকের বৈঠকখানায় আজ আর স্থান নির্দিষ্ট হলো না, সটান চলে এলুম তাঁদের সরিকি শোবার ঘরে। মৃত্যু আজ মুক্ত করে দিয়েছে সমস্ত দরজা, সমস্ত বাধা-নিষেধ।

এক থেকে ষোল বছরের মধ্যে এ পক্ষের আটটি নাবালক। ছেলে-মেয়েরা কেউ-কেউ হাউ-হাউ করে কাঁদছে, কেউ-কেউ ফ্যালফ্যাল করে আছে তাকিয়ে, আর দাদার দেহ আঁকড়ে ধরে বপুষ্মতী একটি মহিলা তারস্বরে শোক করছেন নিম্নের তপশীল বর্ণিত হিসাবে :

‘তোমাকে আমি ছুটি নিতে দিইনি, তোমাকে আমি চিকিৎসা করাতে দিইনি, তোমাকে আমি গাড়ি চড়তে দিইনি, কত চা খেতে ভালোবাসতে,

চা বন্ধ করে দিয়ে লেবুর রস মিশিয়ে তোমাকে গরম জল খেতে দিয়েছি, দু'বেলা বাজার করিয়েছি, চাকর না থাকলে রাস্তা থেকে বালতি করে জল টানিয়েছি, বিছানা পাতিয়ে নিয়েছি, কত তুমি ভালো ছিলে, কত তুমি ভালোবাসতে আমাকে, আমাকে ছেড়ে কোন সুখে তুমি ঘুমিয়ে আছ!'

ব্যারিস্টার বললে : 'আপনারা সব এরেঞ্জ করুন, আমি আমার স্ত্রীকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ সময় স্ত্রীদের সব আসা উচিত। আমার স্ত্রী বলেন মেয়েদের ধৈর্যের আসল পরীক্ষাটাই এ সময়।'

বুঝলুম, ব্যারিস্টার সটকালো।

কাজেকাজেই আমাদের সব জোগাড়-যন্ত্র করতে হলো। দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের জানাবার কোনো সুযোগ ঘটেনি, অপোগণ্ড শিশুগুলো তো নিতান্ত নিরবলম্ব, আর বৌদিদি তো অকূলশোকাকুলা। সুতরাং, কিয়ৎকাল নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে মাইনের স্কেল অনুসারে চাঁদার হার ঠিক করে ফেললুম।

দাদার শেষকৃত্যে—মায় ফুল আর ফটোগ্রাফ—আমাদের ছত্রিশ টাকা সাড়ে ন'আনা খরচ হলো। ছেলেরা যদি কোনোদিন মানুষ হয় ও মনে রাখে!

পরিশিষ্ট

'ওকে আসতে বারণ করে দিতে পারো না, মা ?'

মেয়ের মুখে কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনালো। স্নেহলতা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বললেন, 'তোর বন্ধু, তুই বারণ করলেই তো পারিস।'

'তবু তুমি অভিভাবক, মা। বারণ করাটা তোমারই শোভা পায়।'

'আমি তো এতে বারণ করার কিছুই দেখতে পাই না।' স্নেহলতা য়্যালকোহলে তুলো ভিজিয়ে ইনজেকশানের সূঁচ মুছতে লাগলেন : 'তোকে যদি তার ভালো লেগে থাকে, সে তো ভালোই।'

'ভালোই ?' মায়ের চোখের মধ্যে অণিমা তীক্ষ্ণ চক্ষু ফেললো। শূন্য থেকে খানিকটা হাওয়া মুখে করে নিয়ে বললে, 'অত্যন্ত লজ্জার কথা মা, অত্যন্ত বিশ্রী।'

স্নেহলতা এগিয়ে এসে জিগগেস করলেন, 'এর আগেরটা কোন হাতে দিয়েছিলি ?'

অণিমা তার ডান বাহুটা বাড়িয়ে ধরলো।

বেঁধা জায়গাটা ডলে দিতে দিতে স্নেহলতা বললেন, 'বিয়েটাই একমাত্র বাকি আছে। কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, দিন ফিরেও যেতে পারে বা।'

ব্রজলাল আজ বিকেলবেলায় এসেছে। ইচ্ছে ছিলো অণিমাকে নিয়ে কোথাও যদি বেরুনো যায় বেড়াতে।

দোতলার ফ্ল্যাট। উঠেই খানিকটা বসবার জায়গা, গোল করে কয়েকখানা চেয়ার সাজানো। পিছনে দেয়াল, সামনে দু'খানা ঘর, পাশাপাশি। দরজায় পুরু পর্দা ঝুলছে। পশ্চিমের ঘরটাতে স্নেহলতা রুগী দেখেন। পুবেরটা শোবার, মা ও মেয়ের জন্যে আলাদা খাট পাতা।

দুটোর একটাতেও ব্রজলাল এখনো ঢোকেনি। বাতাসে পর্দা উড়ে

যাবার সময় যা একটু দেখেছে এই বাইরে বসে। ওদের পরে আর কী কোথায় আছে সে অনুমান করতে পারে মাত্র।

আজ চোখে পড়লো পূবের ঘরের পর্দার পিছনে দরজা খিল-দেয়া। মেঘলা পেয়ে গা ঢেলে খুব একচোট ঘুম দিচ্ছে বুঝি অণিমা।

ঝি এলো বেরিয়ে পশ্চিমের ঘর দিয়ে।

'দিদিমণি আছে ?'

'আপনাকে বসতে বললে।'

'কী করছে ?'

ঝি একটু হাসলো। বললে, 'সিগরেট খাচ্ছে।'

ব্রজলাল থ হয়ে গেল। পাঞ্জাবির যে পকেটে তার সিগারেটের প্যাকেট ও দিয়াশলাইর বাক্স থাকে সেটা সে একটু অনুভব করলো হাত দিয়ে। অন্যমনস্কের মতো ধরালো একটা সিগারেট। ভাবলো, সামনা-সামনি খেতেই বা লজ্জা কী!

চেয়ার টানা থেকেই অণিমা বুঝেছে কার ঐ শব্দ। সিগারেট ধরিয়ে একটা টান সে সবে দিয়েছে, মুখের থেকে ধোঁয়াটা তখনো নেয়নি বুকের মধ্যে। সিগারেট একটা শেষ হতে অণিমার পনেরো মিনিটের কমে হয় না। রয়ে-সয়ে জিরিয়ে-জিরিয়ে একটু-একটু করে খাবার ওটা জিনিস, এক ঢোকে গিলে ফেলার মতো নয়। একবার ধরিয়ে নিবিয়ে ফেলার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। কিন্তু পনেরো মিনিট তাকে বাইরে বসিয়ে রাখতেও মায়া করে। টানটা দীর্ঘ করতে গিয়ে অণিমার চোখে জল এলো, তাকালো একবার দরজার দিকে। ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে আগেই বন্ধ করেছিলো সেটা।

যতদূর সম্ভব গিলে-গিলে সিগারেটটা অণিমা শেষ করলো। হ্যাঁ, ওটা সম্পূর্ণ খেয়ে না নিলে মোটেই সে সুস্থ বোধ করতো না। সিগারেটের

শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুলো সুগন্ধি একটা মাউথ-ওয়াশে। কব্জি-পর্যন্ত-হাতা গলা-বন্ধ ব্লাউজ পরে শাড়িটা দ্রুত বিক্ষেপে বদলে নিলো। চুলটা ঠিক করলো কি না-করলো। সন্দেহ হলো চোখের কোলে কালি পড়েছে, স্নো ঘষে-ঘষে সেটাকে একটু ফিকে করলো। ঘাড়ে ও গলায় বুলোলো একটু সেণ্ট।

শোবার ঘরের দোর খুললো না, বেরুলো পাশের ঘর দিয়ে।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে।' শিথিল ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে অণিমা হাসলো। বসলো একটা চেয়ারে, একটু বা দূরে। চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে, একটু টান হয়ে।

'কিন্তু আর বসবো না।' ব্রজলাল অস্থির গলায় বললে, 'চলুন, এখুনি বেরিয়ে পড়ি।'

যে ডাকে সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠবার কথা সে ডাকে অণিমা ভয় পেলো। ঈষৎ নিচু গলায় বললে, 'মা বাড়ি আছেন যে।'

উত্তরটা ব্রজলাল একেবারেই প্রণিধান করতে পারলো না। মা বাড়ি আছেন—থাকবেনই তো বাড়ি—অনেক দিন ধরেই তো আছেন। কত-কত দিন সে আরো এসেছে, কোনোদিন স্নেহলতা ছিলেন, কোনোদিন ছিলেন না, একনজর কোনোদিন দেখেছেন, কোনোদিন বা লক্ষ্যের মধ্যেই আনেন নি। একদিন তো দস্তুরমতো অভ্যর্থনা করে বসিয়েছিলেন মনে আছে।

'আপনার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা তিনি পছন্দ করছেন না।' অণিমা চোখ নামালো।

ব্রজলাল তাকালো একবার অণিমার বেশবাসের দিকে, হাওয়ায় শুঁকলো বা একটু তার গায়ের গন্ধ। বললে, 'আপনি করছেন তাই যথেষ্ট।'

'কিন্তু মার আশ্রয়ে মার বাড়িতে যত দিন আছি—'

'সেই জন্যেই তো বলছি হাওয়া বদলাতে চলুন বাড়ির বাইরে।'

অণিমা কথা বললো না। শ্রান্তের মতো ঘাড় ফেরালো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধের মতো ব্রজলাল প্রশ্ন করলে: 'চাকরিটা আপনি ছাড়লেন কেন?'

সেই দিন যা উত্তর দিয়েছিলো আজো তাই বললে অণিমা। বললে, 'মা বলেন, চাকরি করার দরকার কী। যত দিন আমি আছি তোর খাবার-পরবার ভাবনা নেই।'

'তবু তো করেছিলেন কয়েক মাস।'

'কি জানি খেয়াল হয়েছিলো। একটু চেষ্টা করে দেখতে গিয়েছিলুম। সারা দিন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতো। কাউনসিলর প্রভঞ্জন মল্লিক মার চেনা, কর্পোরেশনের ইস্কুলে জুটিয়ে দিলেন মিসট্রেসি, নিয়ে নিলুম। মাস আষ্টেক ছিলুম বোধ হয়। কিন্তু,' অণিমা ভাসা-ভাসা চোখে তাকালো: 'চাকরির কথা জিগগেস করছেন কেন?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েও তো ফের ফাঁকা-ফাঁকা লাগা উচিত।'

'তা তো উচিত।' অণিমা ম্লান চোখে হাসলো।

'টিউশনি দুটো আছে?'

'সকালেরটা দূরে, ছেড়ে দিয়েছি। সন্ধেরটা পড়াতে আমি যাই না, মেয়েটিই আসে। তাও সব দিন নয়।' অণিমা আবার ভয়ে-ভয়ে তাকালো: 'কিন্তু এ-সব কথা কেন?'

ব্রজলাল গম্ভীর গলায় বললে, 'দেখছি বাড়ি থেকে আপনার বেরুনোই একদম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'প্রায় তাই।'

'বাইরে যদি না পাই তবে কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?'

'কেন, এইখানে।' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল অণিমার। পরে শুকনো গলায় সে একটা ঢোক গিললো : 'দিন-ক্ষণ জানিয়ে আপনাকে আমি চিঠি দেব। সেই অনুসারে—'

'কিন্তু ও-ছাড়া অন্য দিন যদি দেখা করতে ইচ্ছে করে ?'

অণিমা উত্তর দিলো না।

'রোজ যদি ইচ্ছে করে ?'

এবারো কোনো জবাব নেই।

'মা কারু চিরকাল থাকে না।' হঠাৎ খাপছাড়ার মতো ব্রজলাল বলে উঠলো।

'কেউই আমরা চিরকাল নেই।' আবার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অণিমার।

প্রথম দুই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তৃতীয় প্রশ্নের এই নিস্পৃহ জবাবে ব্রজলালের রাগ হলো। দ্রুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তবে যাই।'

চেয়ারের হাতল থেকে অণিমার ডান হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়লো। বললে, 'না, যাবেন না, বসুন।'

ব্রজলাল বসলো। বললে, 'কিন্তু আপনার মা রয়েছেন যে।'

'যখন একবার দেখে ফেলেছেন তখন তো দেখেই ফেলেছেন। এখন আরো খানিকক্ষণ থেকে গেলে ক্ষতি কী ?'

'ওঁর এবেলা কল্ নেই ?'

'হয়তো রাতের দিকে আছে, জানি না। ফিরেছেনই তো প্রায় দুটোয়।'

'কোথায় উনি ?'

'ও-পাশের ঘরে বসে কী পড়ছেন দেখলুম। কিন্তু চোখ কেবল বইয়েতেই নয়।'

ব্রজলাল হাঁসফাঁস করতে লাগলো। বললে, 'যেতেও বলছেন থাকতেও বলছেন এই অবস্থায় কী করি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

'গল্প করুন।'

ব্রজলাল পকেট থেকে প্ল্যায়ার্সের প্যাকেটটা বের করে অণিমার দিকে এগিয়ে ধরলো। বললে, অত্যন্ত সহজ নির্লিপ্তভাবেই বললে, 'নিন, খান একটা।'

'সিগারেট?' মুহূর্তে অণিমার মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললে, 'এ আবার আমি কবে খেতে গেলুম! কোনো ভদ্র মেয়ে খায় নাকি এই সব?' বলে সে শব্দ করে হাসলো। কেমন রুগ্ন, অস্বচ্ছন্দ হাসি।

ব্রজলাল গুটিয়ে নিলো হাত এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও। বুঝতে বাকি রইলো না, সমস্তই আগাগোড়া মিথ্যা, একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি।

'হ্যাঁ, আমার মাইনে অত্যন্ত কম, মোটে একশো টাকা, আর চাকরিটাও বলে বেড়াবার মতো নয়। তাই আপনার পছন্দ হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত। তাই যদি মনে ছিলো তবে আগে এত কাছে ডেকেছিলেন কেন? এটাই বা কোন ভদ্র মেয়ের ব্যবহার? আর, আমি ছাড়া কেই বা সাড়া দিতো আপনার ডাকে? নিজের দিকেও তাকিয়ে দেখবেন একবার। ঐ তো চেহারা—ঐ তো—'

ব্রজলাল বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় ট্রাম-স্টপের কাছে উত্তেজিত পদক্ষেপে সে পাইচারি করছিলো যতক্ষণ না ট্রাম একটা আসে। উঠতে যাবে, দেখলো ট্রাম থেকে স্নেহলতা নামছেন, হাতে তাঁর ডাক্তারি ব্যাগ আর স্টেথিসকোপ।

ব্রজলালের ইচ্ছে হলো চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে স্নেহলতার পিছু-পিছু আবার সে উপস্থিত হয় সেখানে। আরো কতগুলি স্পষ্ট, কঠিন ও নির্লজ্জ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে।

স্নেহলতা উপরে এসে দেখেন অণিমা চেয়ারের কাঁধে দুই হাত রেখে মাথা গুঁজে বসে আছে। বুকের পাশটা ঘন-ঘন ওঠা-নামা করছে।

উঁচু-হিলের আওয়াজ শুনে অণিমা চোখ চেয়ে দেখলো, মা।

'ওকে বারণ করে দিয়েছিস বুঝি আসতে ?' স্নেহলতা তিরস্কারের ভঙ্গিতে জিগগেস করলেন।

'বারণ করলেও শুনতে চায় না, মা।' অণিমা শিথিল পায়ে চলে গেল তার শোবার ঘরে।

আলো জ্বালবার মতো সময় হয়েছে কিন্তু সুইচে হাত দিতে সাহস হলো না। পাছে চকিতে আরশিতে সে নিজের মুখ দেখতে পায়। ঐ তো চেহারা !

আস্তে-আস্তে বসলো গিয়ে তার চেয়ারে, জানলার ধারে। টেবলের উপর সিগারেটের বাক্স। বাক্স থেকে সিগারেট একটা নিয়ে একটুখানি ভাবলো এখুনি ধরাবে কি না। আরো কতক্ষণ যাক। আরো যতক্ষণ যায়। আরো একটু রাত হোক।

টেবলের উপর মাথা গুঁজে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো অণিমা বসে রইলো।

ঐ তো চেহারা।

তবু দু'দিন যেতে না যেতেই ব্রজলাল উপস্থিত। তেমনি বিকেল।

শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল-দেয়া। পশ্চিমেরটা খোলা, পর্দা ঝুলছে।

চেয়ার টানার শব্দ থেকেই বোঝা গেল। বেরিয়ে এলেন স্নেহলতা।

'অণিমা কোথায় ?'

'ঘরে।'

'ওঁর সঙ্গে একটা শেষ কথা ছিলো।' অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে ব্রজলাল বললে।

'ওর শরীরটা আজ ভালো নেই।'

খানিকটা অবাক হলো ব্রজলাল। কোনোদিন ভাবতেই পারেনি অণিমার সম্বন্ধে এমন কথা কখনো শুনতে হবে। যতটুকু সে দেখেছে, শরীর সম্বন্ধে অণিমা বড়ো বেশি হুঁসিয়ার।

তবু, কেউ অসুস্থ শুনলেই মনটা নরম হয়। ব্রজলাল জিগগেস করলে: 'কী অসুখ ?'

'এই সর্দি, কাশি—জ্বর।'

'এ-সময়টা হচ্ছে বটে জ্বরজারি।' ব্রজলাল ঈষৎ দ্বিধা করলো: 'আমি ওঁকে দেখতে পারি না একটু ?'

তবে এত কাছে ডেকেছিলেন কেন ? কথাটা মনে পড়লো ব্রজলালের। আশ্চর্য, কোনোদিন তার বিছানার পাশটিতেও সে বসেনি। দুই চেয়ারের মাঝখানে ছিলো সর্বদা একটা টেবলের ব্যবধান। তারা সম্ভ্রান্ত তো ! তাদের তো বয়েস হয়েছে !

কাছে ডাকা মানে কি শরীরের কাছে ডাকা ? সান্নিধ্য মানে কি সামীপ্য ?

ভাসা-ভাসা ওর সঙ্গে আলাপ, দিন গুনে দেখলে এক বছর এই ঘুরে এসেছে। আগেতে বাইরে, ইদানি বাড়িতে। ছিন্ন ক'টি মুহূর্ত। তবু, এত তারা শ্রান্ত, এত দিনের আলাপ বা প্রতীক্ষার কোনো দরকার ছিলো না। ব্রজলাল সাঁইত্রিশ, অণিমা ত্রিশের ধারে।

ব্রজলাল তাকালো দরজার দিকে।

স্নেহলতা সাদাসিধে গলায় বললেন, 'অনেকক্ষণ পরে এখন ও একটু ঘুমুচ্ছে।'

'অনেকক্ষণ পরে! খুব মাথা ধরেছিলো বুঝি?' কেমন ছেলে-মানুষের মতো বললে ব্রজলাল। কারু মাথা ধরলে যে তার মাথা টিপে দেয়া যায় এমন একটা কথা অনেক আগে, ছেলেবয়সে, কোথায় যেন সে পড়েছিলো।

'বলতে পারি না।'

অথচ, এ বাড়িতে আসে ব্রজলাল দেখেনি আর এমন কাউকে। এলে বলতে বাধা ছিলো না অণিমার। অন্তত না-বলার অর্থ ছিলো না কোনো। এ বয়সে যা লাগে তা আঘাত নয়, শূন্যতার অভ্যস্ত একটু আস্বাদ। ব্রজলাল স্নেহলতাকে একবার দেখলো। এই গরিব লেডি-ডাক্তার আর তার গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—এরা কারা?

'দেখুন,' ব্রজলাল উঠে দাঁড়ালো: 'ওঁর যখন ঘুম ভাঙবে ওঁকে বলবেন আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম।'

স্নেহলতা থমকে গেলেন।

'সেদিন ওঁকে কতগুলো অন্যায় কথা বলেছিলুম আমি। বলবেন সে-সব ভুলে যেতে।'

যেন খানিকটা আলো ঠিকরে পড়লো—ব্রজলালের মনে হলো যেন হঠাৎ শোবার ঘরের দরজা খুলে অণিমা বেরিয়ে এসেছে। চমকে চাইলো পিছনে, আলোও গেল মিলিয়ে।

পড়ন্ত রোদ তার চশমার কাচে লেগে দেয়ালে পিছলে পড়েছে।

রাত্রে একটা ট্রেনের ঠিকানা দিয়ে স্টেশনে দেখা করতে বলে চিঠি দিয়েছে অণিমা। দিন-ক্ষণ জানিয়ে আপনাকে আমি চিঠি দেব, সেই

অনুসারে—। ব্রজলাল চঞ্চল হয়ে উঠলো। এত দিন পরে একসঙ্গে কি তারা পালিয়ে যাবে নাকি ?

আপিস কামাই করে দুপুরবেলাতেই সে সমাগত।

একটু নতুন রকম মনে হচ্ছে—সময়টাই নতুন রকম। শোবার ঘরের দরজা এখন খোলা, পর্দাটাও উত্তোলিত। পিছন থেকে ঘরের মধ্যে অণিমাকে সে চিনতেই পারতো না যদি না দেখতো চেয়ারে বসে সে সিগারেট খাচ্ছে।

ধোঁয়ার একটা উৎকট কদর্য গন্ধ তার নাকে এলো। মড়া পোড়ার গন্ধ। এ সিগারেট ইজিপ্টের না দক্ষিণ আফ্রিকার তামাকের কিছু সে হদিস পেলো না।

শেষ না হতেই হাতের সিগারেটটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অণিমা ডেকে উঠলো : মা। যেন স্বাভাবিক ডাক নয়। বেদনায় বিকৃত। জলমগ্ন। সে-ডাক শুনে এলেন না স্নেহলতা। ঝিটা সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, ভ্রূক্ষেপ করলো না।

ব্রজলাল ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। ঘুরে দাঁড়িয়ে একেবারে অণিমার সামনা-সামনি।

হলদেটে চোখ তুলে অণিমা দেখলো ব্রজলালকে। যেন চিনতে পারলো। শূন্য থেকে খানিকটা হাওয়া মুখে করে নিয়ে বললে, 'আপনি ইনজেকশান করতে পারেন ? তবে শিগগির—' কথাটা শেষ করতে পারলো না।

ব্রজলাল আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অনড়, অথর্ব। এমন কোনোদিন দেখেনি সে অণিমাকে। কল্পনার বাইরে এ অণিমা। চেয়ারে বসে হাতল দুটোর উপর দু'হাতের ভর রেখে গলা তুলে সে শূন্যে বাতাস খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তার বুক হাপরের মতো উঠছে আর পড়ছে অনবরত। পেটটা সেঁধিয়ে যাচ্ছে গর্ত হয়ে।

'কী দাঁড়িয়ে আছেন হাঁ করে ?' অণিমা দমকে-দমকে বললে, 'টেবলের থেকে ইনজেকশানের সিরিঞ্জটা নিন, ওখানেই য়্যাড্রিনেলিনের শিশিটা আছে, দাগ দেখে এক সি-সি তুলে নিয়ে আসুন। একটা ইনজেকশান দিতে হবে। মা বাড়ি নেই। কল থেকে এখনো ফেরেন নি।'

ব্রজলাল চোখে অন্ধকার দেখলো। অস্থিরের মতো বললে, 'আমি এক্ষুনি একজন ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

'না, না, ডাক্তার লাগে না। ও আমিই পারি। আমিই দেব। এখন টান খুব উঠে গেছে বলে টেবলটা পর্যন্ত যেতে পাচ্ছি না। ভীষণ কষ্ট। দয়া করে নিয়ে আসুন ঐ সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশিটা।'

কী করছে কিছুই না বুঝে ব্রজলাল টেবল থেকে সিরিঞ্জে করে এক সি-সি য়্যাড্রিনেলিন তুলে আনলো।

সামান্য একটা সেমিজ শুধু গায়ে ছিলো অণিমার। তাই অনায়াসে বাম বাহুটা ব্রজলালের দিকে সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তলার দিক থেকে জোরে চেপে ধরুন হাতটা। আমিই প্রিক করছি। দেখছেন, ফুঁড়ে-ফুঁড়ে দুই হাতে আর আমার জায়গা নেই।'

ব্রজলাল এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো : 'য়্যালকোহল দিয়ে জায়গাটা একটু মুছে নিলে হতো না ?'

'অত বাবুগিরির সময় নেই। কোনোরকমে সেরে ফেলতে পারলেই হলো। প্রাণ আমার যায়। হ্যাঁ, এবার হাত দিয়ে একটু ডলে দিন জায়গাটা। বুক আমার খুব দপদপ করছে—ও করে। আমাকে একটু হাওয়া করুন।'

বিছানা থেকে হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে ব্রজলাল হাওয়া করতে লাগলো। তার ভয় করতে লাগলো মুহূর্তে না-জানি কী অঘটন ঘটে যা এক্ষুনি।

শ্রান্তের মতো চোখ বুজলো অণিমা।

ক্রমেই যেন শান্ত হয়ে আসছে ঝড়। ক্রমেই যেন অণিমা ফিরে আসছে। এখন তার মুখের যে ভাব সেটা কষ্ট নয়, লজ্জা।

ইসারায় বললো হাওয়া লাগবে না। এলোমেলো চুলগুলোকে খোঁপায় নিয়ে গেল, বেশবাসের শৈথিল্যকে শাসন করলে। গলার হারের সঙ্গে গাঁথা মাদুলিগুলো বেরিয়ে পড়েছিলো, সেগুলো পাঠিয়ে দিলো সেমিজের অন্তরালে।

আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। আলনা থেকে ব্লাউজটা তুলে নিয়ে ব্রজলালের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে পরে নিলো—সেই কব্জি-পর্যন্ত-হাতা গলা-বন্ধ ব্লাউজ। ব্রজলাল ভেবেছিলো এবার বোধহয় বিছানায় যাবে, কিন্তু দাঁড়ালো গিয়ে আয়নার সামনে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি একটু পাউডার বুলিয়ে নিলো।

রাশি-রাশি ওষুধে আকীর্ণ হয়ে আছে টেবলটা, দেখলে ভয় করে। তার ভিতর থেকে সিগারেটের বাক্সটাই ব্রজলালকে বেশি আকর্ষণ করছে। লক্ষ্য করে দেখলো এ তামাকের সিগারেট নয়, ধুতুরার। প্যারিস থেকে এসেছে।

সম্পূর্ণ তৈরি এখন অণিমা। এত তৈরি, চমৎকার সে হাসতে পারছে পর্যন্ত।

বললে, 'আসুন বাইরে।' আর বাইরে এসেই ঘরের পর্দাটা সে ফেলে দিলো।

ওটা যেন রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপট। ভাবলে ব্রজলাল।

বললে, 'এখন কেমন আছেন?'

নিশ্চিন্ত, একটু বা নিষ্ঠুর গলায় অণিমা বললে, 'ভালো।'

'এখন গিয়ে তবে একটু শোন। বড়ো কষ্ট পেয়েছেন।' ব্রজলালের কণ্ঠে শুধু এখন করুণা। শারীরিক করুণা।

'আর আপনি ? হাওয়া করবেন পাশে বসে ?' কালো চোখে অণিমা একটু ঝিলিক দিলো।

'করতে পারি, কিন্তু আপনার মা এসে দেখে ফেলেন সে ভয়।' ব্রজলাল উঠে দাঁড়ালো।

'চললেন ? ইনজেকশানের জায়গাটা যে ভীষণ ব্যথা করছে।'

'ও তো আর আপনার নতুন নয়। নুনের পুঁটলি করে সেঁক দিতে বলুন ঝিকে। এখন আর কথা বলবেন না, চুপচাপ একটু ঘুমোন।'

ব্রজলাল চলে গেল।

রাত্রের ট্রেনের কথাটা ব্রজলালের মনে পড়লো বাইরে এসে। এবং রাত্রে কেমন আছে জানবার জন্যে যেতেই হবে স্টেশনে। না যায়, বাড়িতে গিয়েই তবে খোঁজ নিতে হবে।

স্নেহলতা বললেন, 'ঐ আসছে ব্রজলাল। সিগারেটটা ফেলে দে।'

অনেকগুলি ধোঁয়া ফুসফুসের মধ্যে নিয়ে অণিমা বললে, 'ওঁকে আর লজ্জা নেই, মা।'

গাড়িগুলির মধ্যে থেকে ব্রজলালের তাই চিনে নিতে দেরি হলো না।

'কেমন আছেন এখন ?' ব্রজলালের কণ্ঠে শুধু উদ্বেগ।

'বেশ ভালোই আছি।'

'একা নাকি ?'

'ভীষণ। যদিও গাড়িতে অসম্ভব ভিড়। আপনিও আসুন না।' এমন ভাবে বললে অণিমা, তার চোখের দিকে চাইতে হলো ব্রজলালকে।

'আসুন না, ব্রজলালবাবু।' ওপার থেকে স্নেহলতা মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি আসবেন বলে মেয়েদের গাড়িতে উঠিনি।'

'এই যে, নমস্কার।' পরে অণিমাকে লক্ষ্য করে ব্রজলাল বললে, 'ভারি আশ্চর্য তো, আমি যাবো, আর ওঁর আপত্তি হবে না?'

'না, হবে না। আপনি আসুন।' সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে অণিমা ব্রজলালের হাত ধরলো।

'বা, আমি যাবো কোথায়!' ব্রজলাল উঠলো হেসে।

'কিন্তু আমি কোথায় যাচ্ছি একবারো জিগগেস করলেন না?' অনেক স্তব্ধতার পর, গাড়ি যখন ছাড়ো-ছাড়ো, জিগগেস করলে অণিমা।

'কোথায়?' ব্রজলালের মনে হলো প্রশ্নটা অবান্তর নয়।

'চিত্রকূট।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে কোজাগরী পূর্ণিমা-রাতে শিশিরে-ভেজা পায়েস খাবো।'

'সে আবার কী?'

'ওষুধ। দেখবেন আমি ভালো হয়ে যাবো একেবারে। আমার এই আজন্ম-কালের রোগ এক রাত্রে সেরে যাবে। দেখবেন—'

চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে অণিমা হাসিমুখে স্কুলের মেয়ের মতো তরল গলায় বলতে লাগলো: 'আমি আর এমনি থাকবো না। হয়তো তখন একেবারে চেনাই যাবে না আমাকে। দেখবেন—ততদিন—'

ব্রজলাল একই জায়গায় নিশ্চলের মতো দাঁড়িয়ে।

সিঙ্কের ব্যাণ্ডেজ

আপনি যদি শোনেন যে আপনার প্রতিবেশী তার স্ত্রীকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে, আপনি, যদি মানুষ হন, তবে নিশ্চয়ই ছুটে যাবেন তার ক্রুদ্ধ প্রতিবিধানে, আর যদি তা না পারেন অন্তত আপনার রসনাটা বিষিয়ে উঠবে, কিন্তু যদি শোনেন যে মূর্খ, গোঁয়ার, দজ্জাল স্ত্রী স্বামীকে প্রহার করছে, আপনি কিছুই করবেন না, কেননা এমন কথা কর্ণগোচরই হবে না কোনোদিন।

কেননা যে স্ত্রী মার খায় সে চ্যাঁচায় আর যে স্বামী মার খায় সে হাসে। কান্নাটাই শোনা যায় আর হাসিটা মনে-মনে।

বাইরে থেকে কে বলবে ওরা আদর্শ দম্পতি নয়, বিভূতি আর অরুণা! এখন যদি তাদের কেউ দেখে, বিলের জলে সান্ধ্য নৌ-বিহার করছে। মাঝিটা চুপ করে আছে বসে, পদ্মের দল ঠেলে বিভূতি দুই হাতে দাঁড় টানছে, আর গুন গুন করে গান গাইছে অরুণা।

আমরা তো এইটুকুই শুধু দেখি, অন্তরাল দেখেন অন্তর্যামী।

'তুমি সন্ধে না হতেই ঘরের দরজা এমনি বন্ধ কোরো না বলছি।' বিভূতি বললে।

'নিশ্চয়ই করবো। নইলে যে ব্যাঙ ঢোকে।' বললে অরুণা।

'ব্যাঙ তো ঢুকেই আছে ঘরে। সঙ্গে কিছু হাওয়া ঢুকুক।' দরজাটা খুলে গেল।

কথাটা বিভূতি তরল গলায়ই বলেছিলো, কিন্তু বলা-কওয়া-নেই, অরুণা হঠাৎ পা দিয়ে লাথিয়ে বিভূতির আপিসের এক পাটি জুতো বাইরে ফেলে দিলো।

তারপর ব্যাপারটা যেখানে এসে থামলো সেখানে অরুণার মাথাটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে গিয়েছে আর বিভূতির দুই হাত তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

এখানেও হয়তো থামতো না যদি সে-সময় গণেশ নৌকো নিয়ে না আসতো।

'নৌকো নিয়ে এসেছি, দিদি।' বাইরে থেকে বুড়োটে গলায় কে বললে।

দশ আঙুলে অরুণা তখন বিভূতির টুঁটিটা নখরবিদ্ধ করেছে এমন সময় আর্ত গলায় বিভূতি শব্দ করে উঠলো : 'নৌকো! নৌকো!'

'কে, গণেশ-দাদা নাকি?' মুহূর্তে শিকার ছেড়ে দিয়ে অরুণা ত্রস্ত হাতে বস্ত্রাঞ্চলে দ্রুত বিন্যাস এনে বাইরে বেরিয়ে এলো।

এ-এলেকায় জমিদারের যে কাচারি আছে সেখান থেকে এসেছে এ নৌকো। অরুণার মামা সে-জমিদারের নায়েব। এ-অঞ্চলে বদলি হয়ে এসে অবধি মামাকে সে চিঠি লিখছে নৌকো পাঠাতে—গ্রীন বোট। এমন এখানে বিস্তীর্ণ হাওড়। এখন বর্ষার সময় নদীর মত ঢেউ, অথচ কচুরিপানার বদলে পদ্মপাতায় ভরা।

প্রথম লিখেছিলো ক্ষণাংশিক একটা প্রেমের মুহূর্তে। পরে যে-গুলি লিখেছিলো সেগুলি প্রশ্নোত্তর-পরম্পরায়।

গণেশ এ-কাচারির হালসাহানা। স-কর্ণধার নৌকো নিয়ে এসেছে।

'চলো দিদি, দেরি কোরো না।'

'না, আর দেরি কিসে!' বিভূতি বললে।

'আমার পাঁচ মিনিটো লাগবে না।' বললে অরুণা।

বিভূতি ক্ষতাক্ত জায়গাগুলিতে আইডিন ছুঁইয়ে দিতে লাগলো অরুণা এক বালতি জলে এক শিশি অডিকোলন ঢেলে মাথা ধুতে বসলো।

তারপর বিভূতি পরলো ফিনফিনে সাদা, আর অরুণা পরলো ঝলমলে জর্জেট।

তারপর তারা যখন নৌকো ছাড়লো তখন ঘাটে কত লোক দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখলো সুদূর সম্ভ্রমে আর সবিস্ময় ঈর্ষায়।

আর এখন তো গলা ছেড়েই অরুণা গান ধরেছে ও বৈঠার ঘায়ে বিভূতি জলে দিচ্ছে তাল।

সেদিনের ঝগড়াটা হয়েছিলো আরো তুচ্ছ কারণে। ভর্জিত বেগুনের আকারের শীর্ণতা নিয়ে।

বিভূতি বললে, 'এ তো ভাজার বেগুন নয়, এ বেগুনির বেগুন।'

উত্তরে অরুণা যা বললে তার প্রাঞ্জল অর্থ হচ্ছে এই যে বিভূতির পিতা-পিতামহ চিরকাল আলুপোড়া খেয়েছে, বেগুন খায়নি।

কথাটা যে সমানুপাতিক হয়নি, নিরপেক্ষ কেউ প্রশ্ন করলে অরুণা হয়তো মানতো কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলতো যে পুরুষ হয়ে কেন সে এমনি তুচ্ছ মুলো-বেগুন নিয়ে আলোচনা করবে।

বিভূতি বলবে, যাই কেন না বলি ও বাপ তুলবে কেন। বেগুন নিয়ে বলি ও কুমড়ো নিয়ে বলুক।

এর কোনো মীমাংসা হয় না যতক্ষণ না ডাক্তার ডাকা হয়।

আর ডাক্তার ডাকা হয় বিভূতির জন্যে।

কেননা অরুণা বুঝেছে অত বড় একটা মোটা বই বিভূতির বুকে ছুঁড়ে মারাটা ঠিক হয়নি।

'ঠাকুর, ঠাকুর!' বিভূতি বিছানায় গড়াতে-গড়াতে গোঁ গোঁ করে উঠলো: 'শিগগির এক ছুটে মহেশ-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এস। আমার বুকটা কেমন করছে।'

অরুণা ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলো।

পরে বিছানার পাশে এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'ডাক্তার এলে কী বলবে?'

'কী আর বলবো !' যন্ত্রণায় কাতর মুখে বিভূতি বললে, "কী আর বলতে পারি ? বলবো, বলতে হবে, ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

আশ্বস্ত হয়ে অরুণা এলো বুকে হাত বুলিয়ে দিতে।

'যেটুকু নিশ্বাস এখনো আছে সেটুকু এখনি বন্ধ করে দিতে চাও নাকি ?' বলে বিভূতি স্ত্রীর হাতটা ছুঁড়ে দিলো।

অরুণা খাট থেকে এক ঝটকায় এলো নেমে। বললে 'কিছু হয়নি, অম্বলের ব্যথা হয়তো, তা করছে কী ত্যাখ না।

হন্ত-দন্ত হয়ে হাফ-প্যাণ্ট-পরা মহেশ-ডাক্তার এলো ছুটে।

'কী হলো হঠাৎ ?' স্টেথিস্কোপ উঁচিয়ে মহেশ খাটের কাছে সরে এলো।

বিভূতি সহজ গলায় বললে, 'আমার ব্লাডপ্রেসারটা একটু দেখাবো বলে ডেকেছি। যন্ত্রটা নিয়ে এসেছেন ?'

'ঠাকুর বললে বুকে কী ব্যথা উঠেছে হঠাৎ !'

'সুপুরি খেয়ে বিষম লেগেছিলো, তাই ঠাকুরের একটা ব্রেন-ওয়েভ হয়েছিলো মনে হচ্ছে।'

মহেশ-ডাক্তার স্টেথিস্কোপ গুটোতে-গুটোতে বললে, 'যন্ত্রটা তো আনিনি।'

'তা কাল সকালে দেখলেই হবে। একরাত্রেই আশা করি রগ ছিঁড়ে মারা পড়বো না।'

সেদিনের ঝগড়াটা ধোপার হিসেবের যোগফল নিয়ে। হবে কুড়িখানা, অনেক কাটাকুটি করে পাঞ্জাবিকে সার্ট বানিয়ে অরুণা লিখেছে বাইশ।

আর যায় কোথা !

অরুণার দাদা যে ইস্টিমারের বুকিং-ক্লার্ক, যোগ দেয়া যে সে তাঁরই

কাছে শিখেছে এ নিয়ে বিভূতি টিপ্পনি করে। আর বিভূতির দাদা যে টোলের পণ্ডিত, যোগ-বিয়োগেরই যে সে ধার ধারে না এ চিমটি কাটতে অরুণা কসুর করে না।

বিভূতির অভিযোগ হচ্ছে শালা-সম্বন্ধে এমন একটা রসিকতা করলে সাধারণ স্ত্রীরা সহজেই চেপে যায়, ভাসুর নিয়ে আলোচনা করে না। আর অরুণার অভিযোগ হচ্ছে এই যে পুরুষের পক্ষে ধোপার হিসেবের খাতায় উঁকি মারাটা বর্বরতা।

সমাধান হয় না যখন বিচারক নেই।

অতএব বিভূতির হাতঘড়িটা গুঁড়ো হয়ে যায় আর অরুণার কপালের একটা পাশ ছোট্ট একটা পেপার-ওয়েট হয়ে ওঠে।

অরুণার চুলগুলি তখনো বিভূতির হাতের মুঠোয়, হঠাৎ অরুণা মাথায় ঘোমটা টানবার সচেষ্টতায় স্বাভাবিক গলায় বললে, 'ছাড়ো, মুন্সেফবাবুর বৌ আসছে।'

নিমেষে হাত ছেড়ে দিয়ে বিভূতি বললে, 'আমি ঘরটা গুছিয়ে দিচ্ছি, তুমি শাড়িটা বদলে নাও।'

পদাশ্রিত, এমনি একখানা ভাব থাকার জন্যে বিভূতি মুন্সেফ-গিন্নির সামনে বেরিয়ে থাকে। আপ্যায়িত হতে-হতে ঘরে এনে বসালো। দিলো চেয়ার।

'আপনার স্ত্রী কোথায় ?' মুন্সেফ-গৃহিণী জিগগেস করলেন।

'এই তো উঠলেন ঘুম থেকে। পুকুরে গেছেন মুখ ধুতে।'

কতক্ষণ পরেই ভেজা মুখে অরুণা এলো মুখে ভদ্র হাসি টেনে। বিভূতি তখন আর সেখানে নেই।

'কী, ঝুলন দেখতে যাবেন না ?' মুন্সেফ-গৃহিণী মাথার কাপড়ের নিচে খোঁপাটা অনুভব করতে-করতে জিগগেস করলেন।

'যাবো বৈ কি !'

'যাবেন তো এখনো ঘুমুচ্ছেন কী ?'

'ছুটির দিন—'যেন কী-একটা গূঢ় রসিকতা করছে এমনি ভাবে অরুণা হাসলো।

'ও মা, আপনার কপাল অমন ফুলে উঠলো কি করে ?'

'আর বলবেন না, বাথরুমের দরজাটা হয়েছে ছোট, তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে আসতে চৌকাঠের সঙ্গে ধাক্কা।'

'দেখেছ ?' মুন্সেফ-গৃহিণী শিউরে উঠলেন। বললেন, 'তবে যাবেন কি করে ঝুলনে ?'

'কেন, কপাল ফুললে যাওয়া যায় না ?'

'আমার তো মুখে একটা ব্রণ উঠলেও বাইরে বেরুতে লজ্জা করে।'

'এতে আর লজ্জার কী ! ঘরের কাজ-কর্ম করতে গিয়ে একটা ব্যথা পেয়েছি, এতে লুকোবার কী আছে।'

'তবে চলুন।'

'দাঁড়ান, চুলটা ঠিক করে বেঁধে নি।'

সেদিনের ঝগড়াটা নির্মম মধ্যাহ্নে।

চোখের উপর রোদ এসে পড়েছে, বিভূতি মুখোমুখি জানলাটা দিয়েছিলো বন্ধ করে। খাটে শুয়ে অরুণা উপন্যাস পড়ছিলো, হঠাৎ তার আলো কমে যাওয়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরেই এই জানলা বন্ধ করা নিয়ে বচসা চলছিলো। জানলা একটা বন্ধ হলেই ঘরের আলো একেবারে নিবে যায় না—এ বলে বিভূতি। জানলা একটা খোলা থাকলেই ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় না—এ বলে অরুণা।

অতএব, শেষকালে যখন বিভূতি জোর করেই জানলা বন্ধ করে দিলো,

অরুণা হাতের উপন্যাসখানা টুকরো-টুকরো করে নস্যি-বেচার কাগজে রূপান্তরিত করলে।

উপন্যাসটা একটা ছোকরা-লাইব্রেরির।

ব্যাপারটা যেখানে এসে থামলো সেটা অরুণার বৈধব্যের কাছাকাছি। অর্থাৎ বিভূতি কঠিন দুই হাতে অরুণার মণিবন্ধ নৃশংস চেপে' ধরলো, পাঁচগাছি করে পাৎলা সোনার চুড়ি গেল বেঁকে, দুমড়ে, কিম্ভূতকিমাকার হয়ে। আর সবই বোধ হয় সওয়া যায় গয়নার এই অপমান ছাড়া। দুই টানে ঢলঢলে চুড়িগুলি হাত থেকে খুলে ফেলে অরুণা ক্ষিপ্র বেগে মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলো। ক্ষণলীন বিদ্যুতের জিহ্বা মেলে স্বর্ণচ্ছটাগুলি কে কোন দিকে মিলিয়ে গেল বোঝা গেল না।

জেলে যাওয়ার জন্যে তত নয় যত লোক-জানাজানির ভয়েই বিভূতি অরুণাকে খুন করতে পারলো না। নিচু হয়ে চুড়িগুলি কুড়িয়ে নিতে-নিতে বললে, 'আর কী। দু'হাত খালি করেছ, এবার রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই তো চলে।'

কথাটা কিছু ভেবে বলেনি বিভূতি। কিন্তু অরুণা হঠাৎ গায়ে একটা জামা আঁটলো ও স্যাণ্ডেলটা পায়ে দিয়ে সোজা রাস্তার মুখে বেরিয়ে গেল হনহন করে।

স্পষ্ট দিনের আলোয়, সহরের মধ্যে। লোক-জনের যাওয়া-আসা, পাঁচ-সাত মিনিটের পথ রেলোয়ে-স্টেশন। লোকে বলবে কী! এমন ভাবে চলেছে যেন সতীদাহে যাবে, কিম্বা ঘণ্টা-বাজিয়ে-দেয়া ট্রেন ধরতে হবে, কিম্বা স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে বেরিয়েছে সে ডাক্তারের খোঁজে। ভীষণ বিশ্রী দেখায়, শুধু এই ওজুহাতে বিভূতিও বেরিয়ে পড়লো। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে নয়, শুধু তার সন্নিহিত থাকার জন্যে, নইলে রাস্তায় একাকিনীকে ভালো দেখায় না।

যতই ছুটুক, রসনায় না পারলেও পায়ে অরুণাকে বিভূতি ধরে ফেললো।

কাগজিবাগিচার উপেন মোক্তারের সঙ্গে দেখা। বললে, 'এখুনি যাচ্ছেন? স্পেশ্যাল ট্রেনটা তো রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত আছে।'

কিছু না বুঝেই বিভূতি বললে, 'এখনই তো ভালো।'

ব্যাপারটা বুঝলো সে স্টেশনের কাছাকাছি এসে, নতুন রকমের ট্রেন ও অগুনতি মানুষ দেখে। পূজোর বাজারে ব্যবসায়ীরা কোলকাতা থেকে নানান রকম দোকান সাজিয়ে স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করে এসেছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একদিন থেকে আরেক দিন ঘুরে বেড়াবে।

বিভূতি বললে, 'চলো, দেখে আসি।'

অরুণা কোনো আপত্তি জানালো না।

প্রথমেই চোখে পড়লো কি না একটা জুয়েলার্সের দোকান। সম্ভ্রান্ত ও সার্ধাঙ্গ ভদ্রলোক দেখে দোকানিরা কী আপ্যায়নটাই না করলে!

ডায়মনকাটা এই প্যাটার্নের চুড়িই অরুণার পছন্দ। আট-আট ষোল গাছ। এই বারো-গাছ চুড়ি বদল যাবে—বলে পকেট থেকে ব্যাঁকানো চুড়িগুলি বিভূতি বার করে দিল।

'আর ঐ নেকলেসটা!' এমন আদুরে ভঙ্গি করে অরুণা বললে যা ফিল্মে তোলার মতো।

বিভূতি দ্বিরুক্তি করলে না। বললে, 'আমার সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দিন বাড়িতে, আমি চেকে পেমেণ্ট করবো।'

এ আর বলতে! লোক এলো সঙ্গে। বিভূতি চেক কাটলে।

'যাক, ফাঁকতালে কিছু গয়না হলো!' অম্লান খুসিতে উছলে উঠে অরুণা বললে। নিজের বাক্স খুলে তিনটে টাকা বার করে বললে, 'নাও,

নাও এই তিন টাকা, আমার জমানো থেকে দিচ্ছি, লাইব্রেরিকে ঐ উপন্যাসটা কিনে দিয়ো। শুধু-শুধু কারু আমি ক্ষতি করতে চাই না।' বলেই সে একটু হাসলো।

কিন্তু কতক্ষণ!

এই বর্তমানের সঙ্কীর্ণ চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে বিভূতি একবার নিচের দিকে চাইলো, যেখানে গভীর গহ্বর আছে মুখ মেলে আর যার নাম হচ্ছে ভবিষ্যৎ।

তারপর সেদিন রাত্রে যখন আবার অরুণা বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে বিভূতি আর তাকে অনুসরণ করলে না।

মরা জ্যোৎস্নায় নিঃসাড় রাত, খিল খুলে অরুণা গেল বেরিয়ে। সাজগোজ করলো না, স্যাণ্ডেল পরলো না, ছোট টর্চটাও নিল না সঙ্গে।

বিভূতি স্তব্ধ হয়ে রইলো।

যাক যেখানে খুসি। এত রাত্রে ট্রেন নেই, এত রাত্রে বন্ধুও নেই কোথাও জেগে। তবে একমাত্র মরতে যেতে পারে—নদীর জলে। সে একটা ভয়ানক জানাজানি হয়ে যাবে বটে, কিন্তু যে মরবে সে তো আর কিছু জানতে আসবে না। দু'জনে বেঁচে থেকে যে জানাজানি সেইটেই খারাপ। আর, তবু, খুনের চেয়ে তো সেটা ভদ্র!

বিভূতি লণ্ঠন জেলে তার টেবিলে এসে বসলো। পেড়ে নিলো একটা বই। যেন রাত জেগে কী একটা গভীর গবেষণায় সে ব্যাপৃত।

কতদুর যেতেই সারদা-পিওনের বাড়ি। দেখতে পেয়েছে সারদা-পিওনের বউ।

'এত রাত্রে বাইরে, মা?'

'দেখছ না কী গুমোট করেছে। বাইরে তাই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'একলা কেন? বাবু আসেন নি সঙ্গে?'

'এসেছেন বৈ কি। ঐ এগিয়ে পড়েছেন খানিক।'

লজ্জায় জিভ কেটে ঘোমটা টেনে সারদা-পিওনের বউ জানলা থেকে সরে গেল।

যেন বাবুকেই ধরতে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে অরুণা। কোথায় যাচ্ছে, জানে না—একবার ভাবছে স্টেশনে, একবার ভাবছে থানায়, আরেকবার ভাবছে নদীর জলে। স্বামী যে তাকে আজ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই কথাটার সে আজ চরম ঘোষণা করবে।

কাছেই দেখলো ঝলমল করছে নদী। কী ভেবে ঢাল বেয়ে জলের দিকেই সে নেমে গেল।

সেখানেও নিস্তার নেই।

সেখানে মাখন-জেলে মাছ ধরছে।

'এখানে মা, এত রাত্রে!'

'আর বোলো না, তোমার বাবুর ভীষণ পেটে ব্যথা, একটা শিকড় খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'কী শিকড়?' মাখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'নাম বলতে নেই। নাম বললেই গুণ চলে যায় ওষুধের।' সামনের একটা ঝোপ-ঝাড়ের দিকে অরুণা অগ্রসর হলো: 'মাঝরাতে উঠে স্ত্রীকে গিয়ে উপড়ে তুলে আনতে হবে। পরে বেটে খাওয়াতে হবে রুগীকে।'

'আলো নেই, খুঁজে বার করবে কী, মা? শিকড় ভেবে শেষকালে সাপ-খোপ—'

'সত্যি—' অরুণা রাস্তায় উঠে এলো।

তারপর কোন দিকে না-জানি তাদের বাড়ি। অরুণা অন্ধকারের উপর অন্ধকার দেখলো।

কে-একটা লোক তার পিছু-পিছু আসছে। চেয়ে দেখলো চেনে না লোকটাকে।

অরুণার ভয় করতে লাগলো। সামনে একটা গলি পেলো, তাঁর মধ্যে গেল ঢুকে। আশ্চর্য, লোকটাও তার পিছনে।

মুহূর্তে অরুণা রুখে দাঁড়ালো। বললে, 'কী চাই আপনার ?'

'মনে হচ্ছে আপনি যেন কোথায় যাবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। কোথায় যাবেন আপনি ?' পিছন থেকে লোকটা প্রশ্ন করলে। ব্যবহারটা ঠিক পরিচ্ছন্ন না হলেও কথার স্বরটা বেশ বিনীত।

'আমি বিভূতিবাবুর বাড়ি যাবো।'

'সেটা ও দিকে কোথায় ? আসুন এদিকে।' বলে সে-গলির মধ্যেই লোকটা অরুণাকে হঠাৎ আকর্ষণ করলে।

অসহায় আতঙ্কে অরুণা চ্যাঁচাতে যাচ্ছিলো, বিভূতি তাকে সবলে পার্শ্বসংলগ্ন করে অস্ফুটগলায় বললে, 'চেঁচিয়ো না, লোক-জানাজানি হয়ে যাবে যে।'

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য—ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা